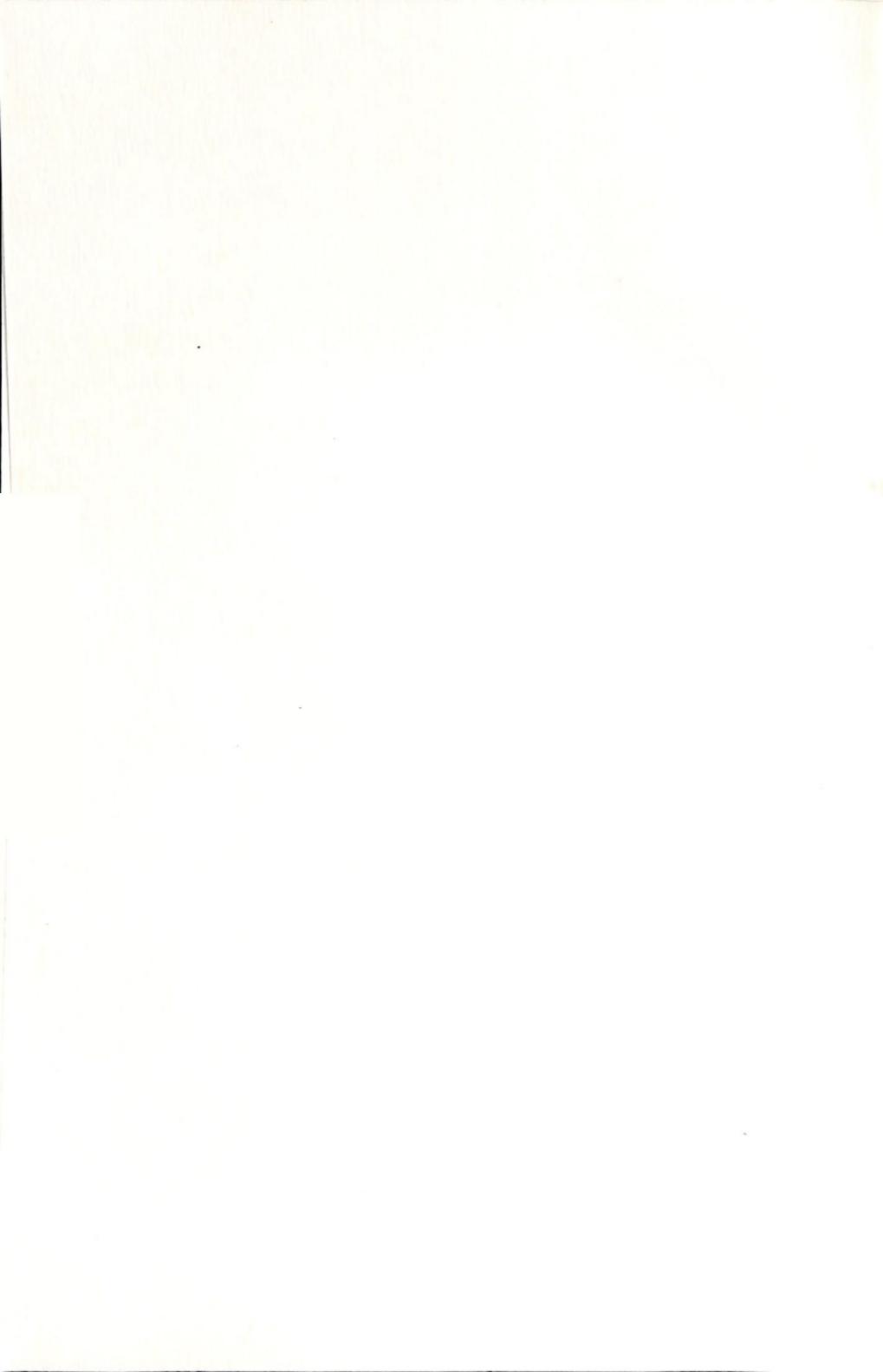


ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ଶରୀରାଧିକାରୀ



ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ -কর্তৃক সপ্তম শ্রেণীর বাংলা অতিরিক্ত সহায়ক পাঠ্যগ্রন্থ-রূপে
অনুমোদিত। বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা টি. বি. ৭৬/৭/এস. আর. বি. ১১৯

প্রকাশ ভাদ্র ১৩৪৭

পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৪৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০, শ্রাবণ ১৩৫১, আষাঢ় ১৩৫২, পৌষ ১৩৫৩
ফাল্গুন ১৩৫৩, চৈত্র ১৩৫৪, ফাল্গুন ১৩৫৫, মাঘ ১৩৬৩, পৌষ ১৩৬৬
অগ্রহায়ণ ১৩৬৮, ভাদ্র ১৩৭১, পৌষ ১৩৭৫, মাঘ ১৩৭৯, মাঘ ১৩৮১
ফাল্গুন ১৩৮৩, বৈশাখ ১৩৮৬, ফাল্গুন ১৩৯১, পৌষ ১৩৯৪
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪০০, পৌষ ১৪০১, অগ্রহায়ণ ১৪০৫
ভাদ্র ১৪০৮, জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩
চৈত্র ১৪১৬, জ্যৈষ্ঠ ১৪২১
চৈত্র ১৪২৪

© বিশ্বভারতী

মূল্য : ৭০.০০ টাকা

ISBN 978-81-7522-403-2

প্রকাশক সবুজকলি সেন
বিশ্বভারতী প্রাচ্যবিভাগ। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রক ডি জি অফিসেট
৯৬/এন মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড। কলকাতা ৬০

ভূমিকা

গেঁসাইজির কাছ থেকে অনুরোধ এল, ছেলেদের জন্যে কিছু লিখি। ভাবলুম, ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক। চেষ্টা করলুম সেই অতীতের প্রেতলোকে প্রবেশ করতে। এখনকার সঙ্গে তার অন্তর-বাহিরের মাপ মেলে না। তখনকার প্রদীপে যত ছিল আলো তার চেয়ে ধোঁয়া ছিল বেশি। বুদ্ধির এলাকায় তখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয় নি, সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্টের সীমা-সরহন্দের চিহ্ন ছিল পরম্পর জড়ানো। সেই সময়টুকুর বিবরণ যে ভাষায় গেঁথেছি সে স্বভাবতই হয়েছে সহজ, যথাসন্তুষ্ট ছেলেদেরই ভাবনার উপযুক্ত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষি কল্পনাজাল মন থেকে কুয়াশার মতো যখন কেটে যেতে লাগল তখনকার কালের বর্ণনার ভাষা বদল করি নি, কিন্তু ভাবটা আপনিই শৈশবকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বিবরণটিকে ছেলেবেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয় নি— কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোরবয়সের মুখোমুখি এসে পৌঁছিয়েছে। সেইখানে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালে বোৰা যাবে, কেমন ক'রে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচ্ছি পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ে ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। সমস্ত বিবরণটাকেই ‘ছেলেবেলা’ আখ্যা দেওয়ার বিশেষ সার্থকতা এই যে, ছেলেমানুষের বৃদ্ধি তার প্রাণশক্তির বৃদ্ধি। জীবনের আদিপর্বে প্রধানত সেইটেরই গতি অনুসরণযোগ্য। যে পোষণপদার্থ তার প্রাণের সঙ্গে আপনি মেলে বালক তাই চারি দিক থেকে সহজে

আত্মসাহ করে চলে এসেছে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীদ্বারা তাকে মানুষ
করবার চেষ্টাকে সে মেনে নিয়েছে অতি সামান্য পরিমাণেই।

এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে,
কিন্তু তার স্বাদ আলাদা— সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো।
সে হল কাহিনী, এ হল কাকলি; সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুঁড়িতে, এটা
দেখা দিচ্ছে গাছে— ফলের সঙ্গে চার দিকের ডালপালাকে মিলিয়ে
দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিছুকাল হল, একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু
কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পদ্যের ফিল্ম। বইটার নাম ‘ছড়ার
ছবি’। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের। তাতে
খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের। এ বইটাতে
বালভাষিত গদ্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ବାଲକ

ବସନ୍ତ ତଥନ ଛିଲ କୀଟା— ହାକା ଦେହଖାନା
ଛିଲ ପାଖିର ମତୋ, ଶୁଧୁ ଛିଲ ନା ତାର ଡାନା ।
ଉଡ଼ିତ ପାଶେର ଛାଦେର ଥେକେ ପାଯରାଗୁଲୋର ଝାଁକ,
ବାରାନ୍ଦାଟାର ରେଲିଙ୍-’ପରେ ଡାକତ ଏସେ କାକ ।
ଫେରିଓୟାଲା ହେଁକେ ଯେତ ଗଲିର ଓ ପାର ଥେକେ
ତପ୍ସି ମାଛେର ଝୁଡ଼ିଖାନା ଗାମଛା ଦିଯେ ଦେକେ ।
ବେହାଲାଟା ହେଲିଯେ କାଁଧେ ଛାଦେର ’ପରେ ଦାଦା,
ମନ୍ଦ୍ୟାତାରାର ସୁରେ ଯେନ ସୁର ହିତ ତାଁର ସାଧା ।
ଜୁଟେଛି ବୁଦ୍ଧିଦିଵିର କାହେ ଇଂରେଜି-ପାଠ ଛେଡି,
ମୁଖଖାନିତେ ସେର-ଦେଓଯା ତାଁର ଶାଢ଼ିଟି ଲାଲ-ପେଡ଼େ ।
ଚୁରି କ'ରେ ଚାବିର ଗୋଛା ଲୁକିଯେ ଫୁଲେର ଟବେ
ମେହେର ରାଗେ ରାଗିଯେ ଦିତେଯ ନାନାନ ଉପଦ୍ରବେ ।
କିଶୋରୀ ଚାଟୁଙ୍ଗେ ହଠାତ ଜୁଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ହଲେ—
ବାଁ ହାତେ ତାର ଥେଲୋ ହୁଁକୋ, ଚାଦର କାଁଧେ ଝୋଲେ ।
ଦ୍ରୁତ ଲମ୍ବେ ଆଉଡେ ଯେତ ଲବକୁଶେର ଛଡ଼ା—
ଥାକ୍ତ ଆମାର ଖାତା ଲେଖା, ପଢେ ଥାକ୍ତ ପଡ଼ା;
ମନେ ମନେ ଇଚ୍ଛା ହିତ, ଯଦିଇ କୋମୋ ଛଲେ
ଭର୍ତ୍ତି ହୋଯା ସହଜ ହିତ ଏହି ପାଁଚାଲିର ଦଲେ,
ଭାବନା ମାଥାଯ ଚାପତ ନାକୋ କ୍ଳାସେ ଓଠାର ଦାୟେ,
ଗାନ ଶୁଣିଯେ ଚଲେ ଯେତୁମ ନତୁନ ନତୁନ ଗାଁଯେ ।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে
হঠাৎ দেখি, মেঘ লেমেছে ছাদের কাছে যেঁষে।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে—
ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল-চালা সব নলে।
অন্ধকারে শোনা যেত রিম্বিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথ-হারা।
ম্যাপে যে-সব পাহাড় জানি, জানি যে-সব গাঙ,
কুয়েন্লুন আর মিসিসিপি ইয়াংসিকিয়াঙ—
জানার সঙ্গে আধেক জানা, দূরের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা,
নানারকম ধৰনির সঙ্গে নানান চলাফেরা,
সব দিয়ে এক হাঙ্কা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,
ভাবনাগুলো তারই মধ্যে ফিরত থাকি থাকি—
বানের জলে শ্যাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।

শাস্তিনিকেতন

আষাঢ় ১৩৪৪

ছে লে বে লা

আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাক্রাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর-গাড়ি। তখন কাজের এত বেশি ইঁসফুঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কবে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ-বা পাঞ্চ চ'ড়ে কেউ-বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার-আধ-ঘোমটা-ওয়ালা; কোচ্বাঙ্গে কোচ্মান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শদে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পাঞ্চির হাঁপ-ধরানো অঙ্ককারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। রোদ-বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেম-সাহেবি; তার মানে লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাত পড়ত পর-পুরুষের সামনে, ফস্ক করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চঁট করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরোবার পাঞ্চিতেও; বড়োমানুষের ঝি-বউদের পাঞ্চির উপরে আরো একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি

গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগ্লানো, দাড়ি চোমড়ানো, ব্যাকে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পেঁচিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পাঞ্চ-সুন্দ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা। দরজায় ফেরিওয়ালা আসত বাস্তু সাজিয়ে, তাতে শিউলন্দনেরও কিছু মূনফা থাকত। আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান, বখরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হ'ত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষম ঝগড়া। আমাদের পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটিত কখনো-বা কঁচা-শাক-সুন্দ মূলো খেত আরামে, আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম ‘রাধাকৃষ্ণ’; সে যতই হাঁ-হাঁ করে দু হাত তুলত আমাদের জেদ ততই বেড়ে উঠত। ইষ্টদেবতার নাম শোনবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি।

তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেডির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ।

মাস্টার-মশায় মিট্মিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফাস্ট বুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘূম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বার বার শুনতে হত মাস্টার-মশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পঁড়ায় আশ্চর্য মন, ঘূম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা বলে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুর্খ হয়ে থাকবার মতো বিক্রী ভাবনাতেও আমাকে

চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি নটা বাজলে ঘুমের ঘোরে চুলুচুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহির মহল থেকে বাড়ির ভিতর খাবার সরু পথ ছিল খড়খড়ির আকুল-দেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিটমিটে আলোর লঠন। চলতুম আর মন বলত, কী জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূত প্রেত ছিল গল্লে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে। কোন্ দাসী কখন হঠাতে শুনতে পেত শৰ্কচুন্নির নাকী সুর, দড়াম্ করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে-ভৃত্যা সব চেয়ে ছিল বদ্মেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘনপাতাওয়ালা বাদাম গাছ, তারই ডালে এক পা আর অন্য পাটা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্ মৃত্তি। তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যখন গল্লটা হেসে উড়িয়ে দিতেন তখন চাকররা মনে করত, লোকটার ধন্মজ্ঞান একটুও নেই; দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে, তখন বিদ্যে যাবে বেরিয়ে। সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলেছিল যে, টেবিলের নীচে পা রাখলে পা সুড়সুড় করে উঠত।

তখন জলের কল বসে নি। বেহারা বাঁধে করে কলসি ভরে মাঘ-ফাণুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অঙ্ককার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। নীচের তলায় সেই-সব স্যাঁৎসেতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করে ছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মতো, পা দুটো উল্টো দিকে। সেই ভৃতুড়ে

ছায়ার সামনে দিয়ে যখন বাড়ি-ভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগাত তাড়।

তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুরুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হ'ত, ঝর্ঘর কল্কল করে ঝরনার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উল্টো দিকে সাঁতার কাটার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিং ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুরুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল তার মধ্যে গাড়ি-গাড়ি রাবিশ। পুরুরটা বুজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ ছায়া-পড়া আয়নাটা যেন গেল সরে। সেই বাদাম গাছটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতেও সেই ব্ৰহ্মাদত্তিৰ ঠিকানা আৱ পাওয়া যায় না।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।

২

পাঞ্জিখানা ঠাকুরমাদের আমলের। খুব দুরাজ বহুর তার, নবাবি ছাঁদের। ডাঙা দুটো আট আট জন বেহারার কাঁধের মাপের। হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, গায়ে লাল রঙের হাত-কাটা মেরজাই-পরা বেহারার দল সূর্য-ডোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধন-দৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে। এই পাঞ্জির গায়ে ছিল রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা, কতক তার গেছে ক্ষয়ে; দাগ

ধরেছে যেখানে-সেখানে, নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের গদি থেকে। এ যেন এ কালের নাম-কটা আসবাব, পড়ে আছে খাতাঞ্চিখানার বারান্দায় এক কোণে। আমার বয়স তখন সাত-আট বছর। এ সংসারে কোনো দরকারি কাজে আমার হাত ছিল না; আর ঐ পুরানো পাঞ্চিটাকেও সকল দরকারের কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। এইজন্যেই ওর উপরে আমার এতটা মনের টান ছিল। ও যেন সমৃদ্ধের মাঝখানে দীপ, আর আমি ছুটির দিনের রবিন্সন-ক্রুশো, বৰ্ধ দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চার দিকের নজরবন্দি এড়িয়ে বসে আছি।

তখন আমাদের বাড়ি-ভরা ছিল লোক, আপন পর কত তার ঠিকানা নেই; নানা মহলের চাকর-দাসীর নানা দিকে হৈ হৈ ডাক।

সামনের উঠোন দিয়ে প্যারীদাসী ধামা কাঁথে বাজার করে নিয়ে আসছে তরিং-তরকারি; দুখন বেহারা বাঁখ কাঁধে গঙ্গার জল আনছে; বাড়ির ভিতরে চলেছে তাঁতিনি নতুন-ফ্যাশান-পেড়ে শাড়ির সওদা করতে; মাইনে-করা যে দিনু স্যাকরা গলির পাশের ঘরে বস্বৈ হাপর ফোস্ ফোস্ ক'রে বাড়ির ফরমাশ খাটত সে আসছে খাতাঞ্চিখানায় কানে-পালখের-কলম-গৌঁজা কৈলাস মুখুজ্জের কাছে, পাওনার দাবি জানাতে; উঠোনে বসে টং টং আওয়াজে পুরোনো লেপের তুলো ধূনছে ধূনুরি। বাইরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে মুকুন্দলাল দারোয়ান লুটোপুটি করতে করতে কুস্তির পঁ্যাচ কষছে; চটাচট শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়, ডন ফেলছে বিশ-পঁচিশ বার ঘন ঘন। ভিথিরির দল বসে আছে বরাদ্দ ভিক্ষার আশা ক'রে।

বেলা বেড়ে যায়, রোদ্দুর ওঠে কড়া হয়ে, দেউড়িতে ঘণ্টা

বেজে ওঠে; পাঞ্চির ভিতরকার দিনটা ঘণ্টার হিসাব মানে না। সেখানকার বারোটা সেই সাবেক কালের, যখন রাজবাড়ির সিংহ-দ্বারে সভাভঙ্গের ডঙ্কা বাজত— রাজা যেতেন স্নানে চন্দনের জলে। ছুটির দিন দুপুরবেলা যাদের তাঁবেদারিতে ছিলুম তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘূম দিছে। একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পাঞ্চি, হাওয়ায়-তৈরি বেহারাণলো আমার মনের নিম্নক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলেছে পাঞ্চি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে-সব দেশের বই পড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কখনো-বা তার পথটা চুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জল জল করছে, গা করছে ছম্ ছম্। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল দুম্! ব্যাস, সব চুপ। তার পরে এক সময়ে পাঞ্চির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঞ্চি; ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ-ছপ-ছপ-ছপ। ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে, ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে, ‘সামাল সামাল, ঝড় উঠল।’ হালের কাছে আবদুল মাঝি, ছুঁচলো তার দাঢ়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ আর কচ্ছপের ডিম।

সে আমার কাছে গল্প করেছিল— একদিন চন্দ্রির মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কালবৈশাখী। ভৌগণ তুফান, নৌকো ডোবে ডোবে। আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁতরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি। গল্পটা এত শিগগির শেষ হল, আমার পছন্দ হল না। নৌকোটা

ডুবল না, অমনিই বেঁচে গেল, এ তো গপ্পই নয়। বার বার বলতে লাগলুম, ‘তার পর?’

সে বললে, ‘তার পর সে এক কাণু! দেখি, এক নেকড়ে বাঘ। ইয়া তার গৌফ-জোড়া। ঝড়ের সময়ে সে উঠেছিল ও পারে গঞ্জের ঘাটের পাকুড় গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল ভেঙে পদ্ধায়! বাঘভায়া ভেসে যায় জলের তোড়ে। খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এতো বড়ো চোখ পাকিয়ে দাঁড়ালো আমার সামনে। সাঁতার কেটে তার জমে উঠেছে খিদে। আমাকে দেখে তার লাল টক্টকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। বাইরে ভিতরে অনেক মানুষের সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়ে গেছে, কিন্তু আবদুলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম, আও বাচ্চা! সে সামনের দু পা তুলে উঠতেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাঢ়াবার জন্যে যতই ছট্টফট্ট করে ততই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে।’

এই পর্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, ‘আবদুল, সে মরে গেল নাকি?’

আবদুল বললে, ‘মরবে তার বাপের সাধ্য কী? নদীতে বান এসেছে, বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে তো? ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্চাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রেশ রাস্তা। গেঁ গেঁ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা, দশ-পনেরো ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছিয়ে দিলে। তার পরেকার কথা আর জিগগেস কোরো না বাবা, জবাব মিলবে না।’

আমি বললুম, ‘আচ্ছা, বেশ, বাঘ তো হল, এবার কুমির?’

আবদুল বললে, ‘জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যখন রোদ পোহায়, মনে হয়, ভারী বিছিরি হাসি হাসছে। বন্দুক থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু মজা হল। একদিন কঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাখারি চাঁচছে, তার ছাগল-ছানা পাশে বাঁধা। কখন নদীর থেকে উঠে কুমিরটা পাঁঠার ঠ্যাঙ ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেনি একেবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দা দিয়ে ঐ দালো-গিরগিটির গলায় পেঁচের উপর পেঁচ লাগালো। ছাগল-ছানা ছেড়ে জন্মটা ডুবে পড়ল জলে।’

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, ‘তার পরে?’

আবদুল বললে, ‘তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, তুলে আনতে দেরি হবে। আসছে বার যখন দেখা হবে চর পাঠিয়ে ঝোঁজ নিয়ে আসব।’

কিন্তু আর তো সে আসে নি, হয়তো ঝোঁজ নিতে গেছে।

এই তো ছিল পাঞ্চির ভিতর আমার সফর। পাঞ্চির বাইরে এক-একদিন ছিল আমার মাস্টারি; রেলিঙগুলো আমার ছাত্র, ভয়ে থাকত চূপ। এক-একটা ছিল ভারি দৃষ্ট, পড়াশুনোয় কিছুই মন নেই; ভয় দেখাই যে, বড়ে হলে কুলিগিরি করতে হবে। মার খেয়ে আগাগোড়া গায়ে দাগ পড়ে গেছে, দুষ্টুমি থামতে চায় না— কেন-না, থামলে যে চলে না, খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আরো একটা খেলা ছিল, সে আমার কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে। পূজায় বলিদানের গন্ন শুনে

ঠিক করেছিলুম সিঙ্গিকে বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মন্ত্র বানাতে হয়েছিল, নইলে পুজো হয় না—

সিঙ্গিমামা কাটুম্,
আন্দিবোসের বাটুম্,
উলুকুট চুলুকুট দ্যাম্বুড় কুড়্
আখ্ৰোট বাখ্ৰোট খ্ট খ্ট খটাস্—
পট্ পট্ পটাস্।

এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা, কেবল আখৰোট কথাটা আমার নিজের। আখৰোট থেতে ভালোবাসতুম। খটাস্ শব্দ থেকে বোৰা যাবে আমার ঝাড়োটা ছিল কাঠের। আৱ পটাস্ শব্দে জানিয়ে দিচ্ছে সে ঝাড়া মজবুত ছিল না।

৩

কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নেই। কেবলই চলছে বৃষ্টি। গাছগুলো বোকার মতো জবুহ্বু হয়ে রয়েছে। পাখির ডাক বন্ধ। আজ মনে পড়ছে আমার ছেলেবেলাকার সঙ্কেবেলা।

তখন আমাদের ঐ সময়টা কাটত চাকরদের মহলে। তখনো ইংরেজি শব্দের বানান আৱ মানে-মুখস্থৰ বুক-ধড়াস্ সঙ্কেবেলার ঘাড়ে চেপে বসে নি। সেজদাদা বলতেন, আগে চাই বাংলাভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োৱা গড় গড় করে আউড়ে চলেছে

I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নীচে,
তখনো বি এ ডি ব্যাড, এম এ ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে
পৌছয় নি।

নবাবি জবানিতে চাকর-নোকরদের মহলকে তখন বলা হ'ত
তোশাখানা। যদিও সেকেলে আমিরি দশা থেকে আমাদের বাড়ি
নেবে পড়েছিল অনেক নীচে, তবু তোশাখানা দফ্তরখানা বৈঠকখানা
নামগুলো ছিল ভিত আঁকড়ে।

সেই তোশাখানার দক্ষিণভাগে বড়ো একটা ঘরে কাঁচের সেজে
রেড়ির তেলে আলো ঝুলছে মিট্মিট্ করে, গণেশ-মার্কা ছবি আর
কালীমায়ের পট রয়েছে দেয়ালে, তারই আশেপাশে টিক্টিকি রয়েছে
পোকা-শিকারে। ঘরে কোনো আসবাব নেই; মেজের উপরে একখানা
ময়লা মাদুর পাতা।

জানিয়ে রাখি আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো। গাড়িযোড়ার
বালাই ছিল না বললেই হয়। বাইরে কোণের দিকে তেঁতুল গাছের
তলায় ছিল চালাঘরে একটা পাক্কিগাড়ি আর একটা বুড়ো ঘোড়া।
পরনের কাপড় ছিল নেহাত সাদাসিধে। অনেক সময় লেগেছিল
পায়ে মোজা উঠতে। যখন ব্রজেশ্বরের ফর্দ এড়িয়ে জলপানের
বরাদ হল পাঁউরুটি আর কলাপাতামোড়া মাখন, মনে হল আকাশ
যেন হাতে নাগাল পাওয়া গেল। সাবেক কালের বড়োমানুষির
ভগ্নদশা সহজেই মেনে নেবার তালিম চলছিল।

আমাদের এই মাদুর-পাতা আসরে যে চাকরটি ছিল সর্দার তার
নাম ব্রজেশ্বর। চুলে গোঁফে লোকটা কাঁচা-পাকা— মুখের উপর
টান-পড়া শুকনো চামড়া, গঙ্গীর মেজাজ, কড়া গলা, চিবিয়ে চিবিয়ে

কথা। তার পূর্ব-মনিব ছিলেন, লক্ষ্মীমন্ত, নাম-ডাক-ওয়ালা। সেখান থেকে তাকে নাবতে হয়েছে আমাদের মতো হেলায়-মানুষ ছেলেদের খবরদারির কাজে। শুনেছি, গ্রামের পাঠশালায় সে গুরুগিরি করেছে। এই গুরুমশায়ি ভাষা আর চাল ছিল তার শেষ পর্যন্ত। 'বাবুরা বসে আছেন' না বলে সে বলত 'অপেক্ষা করে আছেন'। শুনে মনিবরা হাসাহাসি করতেন। যেমন ছিল তার গুমোর তেমনি ছিল তার গুচিবাই। স্নানের সময় সে পুরুরে নেমে উপরকার তেল-ভাসা জল দুই হাত দিয়ে পাঁচ-সাত বার ঠেলে দিয়ে একেবারে ঝুপ্ট করে দিত ডুব। স্নানের পর পুরুর থেকে উঠে বাগানের রাস্তা দিয়ে ব্রজেশ্বর এমন ভঙ্গিতে হাত বাঁকিয়ে চলত যেন কোনোমতে বিধাতার এই নোংরা পৃথিবীটাকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারলেই তার জাত বাঁচে। চালচলনে কোন্টা ঠিক, কোন্টা ঠিক নয়, এ নিয়ে খুব ঝৌক দিয়ে সে কথা কইত। এ দিকে তার ঘাড়টা ছিল কিছু বাঁকা, তাতে তার কথার মান বাড়ত। কিন্তু ওরই মধ্যে একটা খুঁত ছিল গুরুগিরিতে। ভিতরে ভিতরে তার আহারের লোভটা ছিল চাপা। আমাদের পাতে আগে থাকতে ঠিকমতো ভাগে খাবার সাজিয়ে রাখা তার নিয়ম ছিল না। আমরা খেতে বসলে একটি একটি করে লুচি আলগোছে দুলিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করত, 'আর দেব কি?' কোন্ উত্তর তার মনের মতো সেটা বোঝা যেত তার গলার সুরে। আমি প্রায়ই বলতুম, 'চাই নে!' তার পরে আর সে পীড়াপীড়ি করত না। দুধের বাটিটার 'পরেও তার অসামাল রকমের টান ছিল, আমার মোটে ছিল না। শেল্ফওয়ালা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে। তার মধ্যে একটা বড়ো পিতলের বাটিতে থাকত দুধ আর কাঠের বারকোশে লুচি তরকারি।

বিড়ালের লোভ জালের বাইরে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়াত।

এমনি করে অন্ন খাওয়া আমার ছেলেবেলা থেকেই দিবি সয়ে গিয়েছিল। সেই কম খাওয়াতে আমাকে কাহিল করেছিল এমন কথা বলবার জো নেই। যে ছেলেরা খেতে কসুর করত না তাদের চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি বৈ কম ছিল না। শরীর এত বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে, ইঙ্গুল পালাবার বৌক যখন হ্যরান করে দিত তখনো শরীরে কোনোরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সর্দি হল না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি— চুল জামা গেছে ভিজে— গলার মধ্যে একটু খুস-খুসুনি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায় নি। আর, পেট-কামড়ানি বলে ভিতরে ভিতরে বদ-হজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাই নি পেটে, কেবল দরকার-মতো মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে। শুনে মা মনে মনে হাসতেন, একটুও ভাবনা করতেন বলে মনে হয় নি। তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, ‘আচ্ছা, যা, মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর পড়াতে হবে না।’

আমাদের সেকেলে মা মনে করতেন ছেলে মাঝে মাঝে পড়া কামাই করলে এতই কী লোকসান। এখনকার মায়ের হাতে পড়লে মাস্টারের কাছে তো ফিরে যেতেই হ'ত, তার উপরে খেতে হত কান-ঘলা; হয়তো-বা মুচকি হেসে গিলিয়ে দিতেন ক্যাস্টের অয়েল— চিরকালের জন্যে আরাম হ'ত ব্যামোটা। দৈবাং কখনো আমার জ্বর হয়েছে— তাকে কেউ জ্বর বলত না, বলত গা-গরম। ‘আসতেন নীলমাধব ডাক্তার। থার্মোমিটার তখন চক্ষেও দেখি নি; ডাক্তার

একটু গায়ে হাত দিয়েই প্রথম দিনের ব্যবস্থা করতেন ক্যাস্টর অয়েল আর উপোস। জল খেতে পেতুম অল্ল একটু, সেও গরম জল; তার সঙ্গে এলাচ-দানা চলতে পারত। তিনি দিনের দিনই মৌরলা মাছের খোল আর গলা ভাত উপোসের পরে ছিল অমৃত।

জুরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া বলে শব্দটা শোনাই ছিল না। ওয়াক্-ধরানো ওষুধের রাজা ছিল ঐ তেলটা, কিন্তু মনে পড়ে না কুইনীন। গায়ে ফোড়া-কাটা ছুরির আঁচড় পড়ে নি কোনোদিন। হাম বা জল-বসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে। শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো।

মায়েরা যদি ছেলেদের শরীর এতটা নিরুগী রাখতে চান যাতে মাস্টারের হাত এড়াতে না পারে, তা হলে ব্রজেশ্বরের মতো চাকর খুঁজে বের করবেন। খাবার-খরচার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাঁচাবে ডাক্তার-খরচা; বিশেষ করে এই কলের ঝাঁতার ময়দা আর এই ভেজাল-দেওয়া ধি-তেলের দিনে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, তখনো বাজারে চকোলেট দেখা দেয় নি। ছিল এক পয়সা দামের গোলাপি-রেউড়ি। গোলাপি-গন্ধের-আমেজ-দেওয়া এই তিলে ঢাকা চিনির ড্যালা আজও ছেলেদের পকেট চট্টটে করে তোলে কি না জানি নে; নিশ্চয়ই এখনকার মানী লোকের ঘর থেকে লজ্জায় দৌড় মেরেছে। সেই ভাজা মসলার ঠোঙা গেল কোথায়? আর সেই সস্তা দামের তিলে গজা? সে কি এখনো টিঁকে আছে? না থাকে তো তাকে ফিরিয়ে আনার দরকার নেই।

ব্রজেশ্বরের কাছে সন্কেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাত-কাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী

চাটুজ্জে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সূর-সমেত তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে ক্ষতিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হ হ করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা— ‘ওরে রে লক্ষণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।’ তার মুখে হাসি, মাথায় টাক ঝক্ক ঝক্ক করছে, গলা দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের ঝর্না সূর বাজিয়ে চলছে, পদে পদে শব্দের মিলগুলো বেজে ওঠে যেন জলের নিচেকার নুড়ির আওয়াজ। সেই সঙ্গে চলত তার হাত পা নেড়ে ভাব-বাংলানো।

কিশোরী চাটুজ্জের সব চেয়ে বড়ো আপশোস ছিল এই যে দাদাভাই, অর্থাৎ কি না আমি, এমন গলা নিয়ে পাঁচালির দলে ভর্তি হতে পারলুম না। পারলে দেশে যা-হয় একটা নাম থাকত।

রাত হয়ে আসত, মাদুর-পাতা বৈঠক যেত ভেঙে। ভূতের ভয় শিরদাঁড়ার উপর চাপিয়ে চলে যেতুম বাড়ির ভিতরে মায়ের ঘরে। মা তখন তাঁর খুড়িকে নিয়ে তাস খেলছেন। পংখের-কাজ-করা ঘর হাতির দাঁতের মতো চক্রকে, মস্ত তক্ষপোষের উপর জাজিম পাতা। এমন উৎপাত বাধিয়ে দিতুম যে, তিনি হাতের খেলা ফেলে দিয়ে বলতেন, ‘ঞালাতন করলে! যাও খুড়ি, ওদের গল্প শোনাও গে।’ আমরা বাইরের বারান্দায় ঘটির জলে পা ধুয়ে দিদিমাকে টেনে নিয়ে বিছানায় উঠতুম। সেখানে শুরু হ'ত দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে আনার পালা। মাঝখানে আমারই ঘুম ভাঙায় কে। রাতের প্রথম পহুঁচে শেয়াল উঠত ডেকে। তখনো শেয়াল-ডাকা রাত কলকাতার কোনো কোনো পুরোনো বাড়ির ভিতরে নীচে ফুকরে উঠত।

আমরা যখন ছেটো ছিলুম তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা যেমনি ফুরিয়েছে অমনি শুরু হয়েছে বিজলি আলোর দিন। সে সময়টাতে শহরে কাজ কম, কিন্তু বিশ্রাম নেই। উন্ননে যেন ছলা কাঠ নিভেছে, তবু কয়লায় রয়েছে আগুন।— তেলকল চলে না, সিটমারের বাঁশি থেমে থাকে, কারখানা-ঘর থেকে মজুরের দল বেরিয়ে গেছে, পাটের-গাঁট-টানা গাড়ির মোষগুলো গেছে টিনের চালের নীচে শহরে গোঠে। সমস্তদিন যে শহরের মাথা ছিল নানা চিন্তায় তেতে আগুন, এখনো তার নাড়ীগুলো যেন দ্ব্ৰ দ্ব্ৰ করছে। রাস্তার দু ধারে দোকানগুলোতে কেনাবেচা তেমনি আছে, কেবল সামান্য কিছু ছাই-চাপা। রকম-বেরকমের গোঙানি দিতে দিতে হাওয়া-গাড়ি ছুটেছে দশ দিকে, তাদের দৌড়ের পিছনে গরজের ঠেলা কম।

আমাদের সেকালে দিন ফুরোলে কাজকর্মের বাড়তি ভাগ যেন কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ত শহরের বাতি-নেবানো নীচের তলায়। ঘরে বাইরে সন্ধ্যার আকাশ থম্ থম্ করত। ইডেন গার্ডেনে গঙ্গার ধারে শৌখিনদের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে ফেরবার গাড়িতে সইসদের হৈ হৈ শব্দ রাস্তা থেকে শোনা যেত। চৈৎ-বৈশাখ মাসে রাস্তায় ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত ‘বৱীফ’। হাঁড়িতে বরফ দেওয়া নোনতা জলে ছেটো ছেটো টিনের চোঙে থাকত যাকে বলা হ'ত কুলফির বরফ, এখন যাকে বলে আইস কিংবা আইসক্রিম। রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই ডাকে মন কিরকম করত তা মনই জানে। আর-একটা হাঁক ছিল ‘বেলফুল’।

বসন্তকালের সেই মালীদের ফুলের ঝুঁড়ির খবর আজ নেই,
কেন জানি নে। তখন বাড়িতে মেয়েদের খোঁপা থেকে বেলফুলের
গোড়ে-মালার গন্ধ ছড়িয়ে যেত বাতাসে। গা ধূতে যাবার আগে
ঘরের সামনে ব'সে, সমুখে হাত-আয়না রেখে মেয়েরা চুল বাঁধত।
বিনুনি-করা চুলের দড়ি দিয়ে খোঁপা তৈরি হ'ত নানা কারিগরিতে।
তাদের পরনে ছিল ফরাসভাঙ্গার কালাপেড়ে শাড়ি, পাক দিয়ে
কুঁচকিয়ে তোলা। নাপতিনি আসত, ঝামা দিয়ে পা ঘসে আলতা
পরাত। মেয়েমহলে তারাই লাগত খবর-চালাচালির কাজে। ট্রামের
পায়দানের উপর ভিড় করে কলেজ আর অপিস-ফেরার দল ফুটবল
খেলার ময়দানে ছুটত না। ফেরবার সময় তাদের ভিড় জমত না
সিলেমা-হলের সামনে। নাটক-অভিনয়ের একটা ফুর্তি দেখা দিয়েছিল,
কিন্তু, কী আর বলব, আমরা সে সময়ে ছিলুম ছেলেমানুষ।

তখন বড়োদের আমোদে ছেলেরা দূর থেকেও ভাগ বসাতে
পেত না। যদি সাহস করে কাছাকাছি যেতুম তা হলে শুনতে হ'ত,
'ঘাও, খেলা করো গো।' অথচ ছেলেরা খেলায় যদি উচিতমতো
গোল করত তা হলে শুনতে হ'ত, 'চুপ করো।' বড়োদের আমোদ-
আহ্লাদ সব সময় খুব যে চুপচাপে সারা হ'ত তা নয়। তাই দূর
থেকে কখনো কখনো ঝর্নার ফেনার মতো তার কিছু কিছু পড়ত
ছিটকিয়ে আমাদের দিকে। এ বাড়ির বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে
থাকতুম; দেখতুম ও বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোময়। দেউড়ির
সামনে বড়ো বড়ো জুড়িগাড়ি এসে জুটেছে। সদর দরজার কাছ
থেকে দাদাদের কেউ কেউ অতিথিদের উপরে আগিয়ে নিয়ে
যাচ্ছেন। গোলাপ-পাশ থেকে গায়ে গোলাপ জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন,

হাতে দিচ্ছেন ছেটো একটি ক'রে তোড়া। নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফুঁপিয়ে কান্না কখনো কখনো কানে আসে, তার মর্ম বুঝতে পারি নে। বোববার ইচ্ছেটা হয় প্রবল। খবর পেতুম, যিনি কাঁদতেন তিনি কুলীন বটে, কিন্তু তিনি আমার ভগীপতি। তখনকার পরিবারে যেমন মেয়ে আর পুরুষ ছিল দুই সীমানায় দুই দিকে, তেমনি ছিল ছেটোরা আর বড়োরা। বৈঠকখানায় ঝাড়-লঠনের আলোয় চলছে নাচগান; গুড়গুড়ি টানছেন বড়োর দল; মেয়েরা লুকোনো থাকতেন ঝরোখার ও পারে চাপা আলোয় পানের বাটা নিয়ে— সেখানে বাইরের মেয়েরা এসে জমতেন, ফিস ফিস ক'রে চলত গেরস্তালির খবর। ছেলেরা তখন বিছানায়। পিয়ারী কিংবা শংকরী গন্ধ শোনাচ্ছে, কানে আসছে—

‘জোচ্ছনায় যেন ফুল ফুটেছে’...

৫

আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনী-ঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহি-গলা-ওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধূম ছিল। আমাদের মেজকাকা ছিলেন এইরকম একটি শখের দলের দলপতি। পালারচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল। ধনীদের ঘরপোষা এই যেমন শখের যাত্রা তেমনি ব্যাবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলাদেশের ছিল ভারি নেশা। এ পাড়ায়, ও পাড়ায়, এক-একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত। দলকর্তা অধিকারীরা সবাই যে জাতে বড়ো কিংবা

লেখাপড়ায় এমন-কিছু তা নয়। তারা নাম করেছে আপন ক্ষমতায়। আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু রাস্তা নেই, ছিলুম ছেলেমানুষ। আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড়-যন্ত্র। বারান্দা ভূড়ে বসে গেছে দলবল, চারি দিকে উঠছে তামাকের ধোঁওয়া। ছেলেগুলো লস্বা-চুল-ওয়ালা, চোখে-কালি-পড়া অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে, পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রঙ-করা টিনের বাস্তোয়। দেউড়ির দরজা খোলা, উঠোনে পিল্ পিল্ করে চুকে পড়ছে লোকের ভিড়। চার দিকে টগ্বগ্ করে আওয়াজ উঠছে, ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায়। রাত্রি হবে নটা; পায়রার পিঠের উপর বাজপাথির মতো হঠাতে এসে পড়ে শ্যাম, কড়াপড়া শক্ত হাতের মুঠি দিয়ে আমার কনুই ধ'রে বলে, ‘মা ডাকছে, চলো শোবে চলো।’ লোকের সামনে এই টানাহেঁচড়ায় মাথা হেঁট হয়ে যেত, হার মেনে চলে যেতুম শোবার ঘরে। বাইরে চলছে হাঁকডাক, বাইরে জ্বলছে ঝাড়-লঠ্ঠন। আমার ঘরে সাড়াশব্দ নেই, পিলসুজের উপর টিম্ টিম্ করছে পিতলের প্রদীপ। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে নাচের তাল সমে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম করতাল।

সব-তাতে মানা করাটাই বড়েদের ধর্ম। কিন্তু একবার কী কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল, হ্রকুম বেরোল ছেলেরাও যাত্রা শুনতে পাবে। ছিল নলদময়ন্তীর পালা। আরস্ত হবার আগে রাত এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় ছিলুম ঘুমিয়ে। বার বার ভরসা দেওয়া হ'ল, সময় হ'লেই আমাদের জাগিয়ে দেবে। উপরওয়ালাদের দস্তর জানি, কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। কেন-না, তাঁরা বড়ো, আমরা ছোটো।

সে রাত্রে নারাজ দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলুম। তার একটা কারণ, মা বললেন, তিনি স্বয়ং আমাকে জাগিয়ে দেবেন। আর-একটা কারণ, নটার পরে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে বেশ একটু ঠেলাঠেলির দরকার হ'ত। এক সময়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হ'ল বাইরে। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। একতলায় দোতলায় রঙিন ঝাড়-লঠন থেকে ঝিলিমিলি আলো ঠিকরে পড়ছে চার দিকে, সাদা বিছানো চাদরে উঠেনটা চোখে ঠেকছে মন্ত। এক দিকে বসে আছেন বাড়ির কর্তারা আর যাঁদের ডেকে আনা হয়েছে। বাকি জায়গাটা যার খুশি যেখান থেকে এসে ভরাট করেছে। থিয়েটরে এসেছিলেন পেটে-সোনার-চেন-বোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘেঁষাঘেষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই, ভদ্র লোকেরা যাদের বলে ‘বাজে লোক’। তেমনি আবার পালা-গানটা লেখানো হয়েছে এমন-সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া-কলমে, যারা ইংরেজি কপিবুকের মক্ষো করে নি। এর সূর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা-করা; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় দেন নি পালিশ ক'রে।

সভায় যখন দাদাদের কাছে এসে বসলুম, কুমালে কিছু কিছু টাকা বেঁধে আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটাতে ঐ টাকা ছুঁড়ে দেওয়া ছিল রীতি। এতে যাত্রাওয়ালার ছিল উপরি পাওনা, আর গৃহস্থের ছিল খোশনাম।

রাত ফুরোত, যাত্রা ফুরোতে চাইত না। মাঝাখানে নেতিয়ে-পড়া দেহটাকে আড়কোলা করে কে যে কোথায় নিয়ে গেল জানতেও পারি নি। জানতে পারলে সে কি কম লজ্জা— যে মানুষ বড়োদের

সমান সারে ব'সে বকশিশ দিচ্ছে ছুঁড়ে, উঠোনসুন্দ লোকের সামনে
তাকে কিনা এমন অপমান ! ঘূম যখন ভাঙল দেখি মায়ের তক্ষপোষ্যে
শয়ে আছি। বেলা হয়েছে বিস্তর, বাঁ বাঁ করছে রোদ্দুর। সূর্য উঠে
গেছে অথচ আমি উঠি নি, এ ঘটে নি আর-কোনো দিন।

শহরে আজকাল আমোদ চলে নদীর স্রোতের মতো। মাঝে
মাঝে তার ফাঁক নেই। রোজই যেখানে-সেখানে যখন-তখন সিনেমা,
যে খুশি ঢুকে পড়ছে সামান্য খরচে। সে কালে যাত্রাগান ছিল যেন
শুকনো গাঞ্জে কোশ দু-কোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘণ্টা
কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁজলা ভৈরে
তেষ্টা নেয় মিটিয়ে।

আগেকার কালটা ছিল যেন রাজপুত্র। মাঝে মাঝে পাল-
পার্বণে যখন মর্জি হ'ত আপন এলেকায় করত দান-খয়রাত। এখনকার
কাল সদাগরের পুত্র, হরেক রকমের ঝাক্ঝাকে মাল সাজিয়ে
বসেছে সদর রাস্তার চৌমাথায়— বড়ো রাস্তা থেকে খদ্দের আসে,
ছোটো রাস্তা থেকেও।

৬

চাকরদের বড়োকর্তা বজেশ্বর। ছোটোকর্তা যে ছিল তার নাম শ্যাম—
বাড়ি যশোরে, খাঁটি পাড়াগেঁয়ে, ভাষা তার কলকাতায় নয়। সে
বলত— তেনারা, ওনারা, খাতি হবে, যাতি হবে, মুগির ডাল, কুলির
আম্বল। 'দোমনি' ছিল তার আদরের ডাক। তার রঙ ছিল শ্যামবর্ণ,
বড়ো বড়ো চোখ, তেল-চুক্কুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারা শরীর।
তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা। ছেলেদের 'পরে

তার ছিল দরদ। তার কাছে আমরা ডাকাতের গল্প শুনতে পেতুম। তখন ভূতের ভয় যেমন মানুষের মন জুড়ে ছিল, তেমনি ডাকাতের গল্প ছিল ঘরে ঘরে। ডাকাতি এখনো কম হয় না; খুনও হয়, জখমও হয়, লুঠও হয়, পুলিসও ঠিক লোককে ধরে না। কিন্তু, এ হ'ল খবর, এতে গল্পের মজা নেই। তখনকার ডাকাতি গল্পে উঠেছিল দানা বেঁধে, অনেকদিন পর্যন্ত মুখে মুখে চারিয়ে গেছে। আমরা যখন জন্মেছি তখনো এমন-সব লোক দেখা যেত যারা সমর্থ বয়সে ছিল ডাকাতের দলে। মশ্ত মশ্ত সব লাঠিয়াল, সঙ্গে সঙ্গে চলে লাঠিখেলার সাক্রেন। তাদের নাম শুনলেই লোক সেলাম করত। প্রায়ই ডাকাতি তখন গোঁয়ারের মতো নিছক খুন-খারাবির ব্যাপার ছিল না। তাতে যেমন ছিল বুকের পাটা তেমনি দরাজ মন। এ দিকে ভদ্রলোকের ঘরেও লাঠি দিয়ে লাঠি ঠেকাবার আখড়া বসে গিয়েছিল। যারা নাম করেছিল ডাকাতরাও তাদের মানত ওস্তাদ বলৈ, এড়িয়ে চলত তাদের সীমানা। অনেক জমিদারের ডাকাতি ছিল ব্যাবসা। গল্প শুনেছি, সেই জাতের একজন দল বসিয়ে রেখেছিল নদীর মোহানায়। সেদিন অমাবস্যা, পুজোর রাত্তির, কালী কক্ষালীর নামে মুণ্ড কেটে মন্দিরে যখন নিয়ে এল জমিদার কপাল চাপড়ে বললে, ‘এ যে আমারই জামাই!’

আরো শোনা যেত রঘু ডাকাত, বিশু ডাকাতের কথা। তারা আগে থাকতে খবর দিয়ে ডাকাতি করত, ইতরপনা করত না। দূর থেকে তাদের হাঁক শুনে পাড়ার রক্ত যেত হিম হয়ে। মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তাদের ধর্মে ছিল মানা। একবার একজন মেয়ে খাঁড়া হাতে কালী সেজে উল্টে ডাকাতের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করেছিল।

আমাদের বাড়িতে একদিন ডাকাতের খেলা দেখানো হয়েছিল। মস্ত মস্ত কালো কালো জোয়ান সব, লস্বা লস্বা চুল। টেকিতে চাদর বেঁধে সেটা দাঁতে কামড়ে ধরে দিলে টেকিটা টপ্কিয়ে পিঠের দিকে। ঝাঁকড়া চুলে মানুষ দুলিয়ে লাগল ঘোরাতে। লস্বা লাঠির উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল দোতলায়। একজনের দুই হাতের ফাঁক দিয়ে পাখির মতো সুট করে বেরিয়ে গেল। দশ-বিশ কোশ দূরে ডাকাতি সেরে সেই রাষ্ট্রেই ভালো মানুষের মতো ঘরে ফিরে এসে শুয়ে থাকা কেমন করে হতে পারে তাও দেখালে। খুব বড়ো একজোড়া লাঠির মাঝখানে আড়-করা একটা করে পা রাখবার কাঠের টুকরো বাঁধা। এই লাঠিকে বলে রন্পা। দুই হাতে দুই লাঠির আগা ধরে সেই পাদানের উপর পা রেখে চললে এক পা ফেলা দশ পা ফেলার সামিল হ'ত, ঘোড়ার চেয়ে দৌড় হ'ত বেশি। ডাকাতি করবার মতলব যদিও মাথায় ছিল না, তবু এক সময়ে এই রন্পায় চলার অভ্যাস তখনকার শান্তিনিকেতনে ছেলেদের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করেছিলুম। ডাকাতি খেলার এই ছবি শ্যামের মুখের গল্লের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কতবার সক্ষে কাটিয়েছি দু হাতে পাঁজর চেপে ধরে।

ছুটির রবিবার। আগের সক্ষেবেলায় বিবি ডাকছিল বাইরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে, গল্পটা ছিল রঘু ডাকাতের। ছায়া-কাঁপা ঘরে মিট্টিটে আলোতে বুক করছিল ধূক ধূক। পরদিন ছুটির ফাঁকে পাক্কিতে চড়ে বসলুম। সেটা চলতে শুরু করল বিনা চলায়, উড়ো ঠিকানায়, গল্লের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের স্বাদ দেবার জন্যে। নিমুম অন্ধকারের নাড়ীতে যেন তালে তালে বেজে উঠছে

বেহারাগুলোর হাঁই-হই হাঁই-হই, গা করছে ছম্ ছম্। ধূ ধূ করে মাঠ,
বাতাস কাঁপে রোদ্দুরে। দূরে ঝিক ঝিক করে কালীদিঘির জল,
চিক চিক করে বালি। ডাঙুর উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে ফাটলধরা
ঘাটের দিকে ডালপালা-ছড়ানো পাকুড় গাছ।

গল্পের আতঙ্ক জমা হয়ে আছে না-জানা মাঠের গাছতলায় ঘন
বেতের ঝোপে। যত এগোছি, দূর দূর করছে বুক। বাঁশের লাঠির
আগা দুই-একটা দেখা যায় ঝোপের উপর দিকে। কাঁধ বদল করবে
বেহারাগুলো এখানে। জল খাবে, ভিজে গামছা জড়াবে মাথায়।
তার পরে?—

‘রে রে রে রে রে!'

৭

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতাকল চলছেই ঘর্ষের শব্দে।
এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের
হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা। তস্ফুরার তারে অত্যন্ত বেশি
টান দিতে গেলে পটাঙ ক'রে যায় ছিঁড়ে। তিনি আমাদের মনে
যতটা বেশি মাল বোঝাই করতে চেয়েছিলেন তার অনেকটাই ডিঙি
উল্টিয়ে তলিয়ে গেছে, এ কথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না।
আমার বিদ্যোটা লোকসানি মাল।

সেজদাদা তাঁর বড়ো মেয়েকে শিখিয়ে তুলতে লেগেছিলেন।
যথাসময়ে তাকে দিয়েছিলেন লোরেটোতে ভর্তি করে। তার পূর্বেই
তার ভাষায় প্রথম দখল হয়ে গেছে বাংলায়।

প্রতিভাকে বিলিতি সংগীতে পাকা করে তুললেন। তাতে করে তাকে দিশি গানের পথ ভুলিয়ে দেওয়া হয় নি, সে আমরা জানি। তখনকার দিনে ভদ্র পরিবারে হিন্দুস্থানি গানে তার সমান কেউ ছিল না। বিলিতি সংগীতের গুণ হচ্ছে তাতে সুর সাধানো হয় খুব খাঁটি করে, কান দোরস্ত হয়ে যায়, আর পিয়ানোর শাসনে তালেও ঢিলেমি থাকে না। এ দিকে বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভর্তি হতে হল। বিষ্ণু যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার কানের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলায়। দুই-একটা নমুনা দিই—

এক যে ছিল বেদের মেয়ে

এল পাড়াতে

সাধের উক্কি পরাতে।

আবার উক্কি-পরা যেমন-তেমন

লাগিয়ে দিল ভেক্কি—

ঠাকুরবি,

উক্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি—

ঠাকুরবি!

আরো কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে, যেমন—

চন্দ্ৰ সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জ্বালে বাতি।

মোগল পাঠান হন্দ হল,

ফার্সি পড়ে তাঁতি।

...

গণেশের মা, কলাবউকে জ্বালা দিয়ো না,
তার একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানাপোনা।

অতি পুরোনো কালের ভুলে-যাওয়া খবরের আমেজ আসে এমন
লাইনও পাওয়া যায়, যেমন—

এক যে ছিল কুকুর-চাটা
শেষালক্ষ্টার বন
কেটে করলে সিংহাসন।

এখনকার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে হারমোনিয়মে সুর লাগিয়ে সা-
রে গা মা সাধানো, তার পরে হাঙ্কা গোছের হিন্দিগান ধরিয়ে
দেওয়া। তখন আমাদের পড়াশুনোর যিনি তদারক করতেন তিনি
বুরোছিলেন ছেলেমানুষি ছেলেদের মনের আপন জিনিস, আর ঐ
হাঙ্কা বাংলাভাষা হিন্দিবুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে জায়গা করে
নেয়। তা ছাড়া এ ছন্দের দিশি তাল বাঁয়া-তবলার বোলের তোয়াকা
রাখে না, আপনা-আপনি নাড়ীতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন-
ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের
মন-ভোলানো গান শেখানোর শুরু সেই ছড়ায়— এইটে আমাদের
উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।

তখন হারমোনিয়ম আসে নি এ দেশের গানের জাত মারতে।
কাঁধের উপর তস্তুরা তুলে গান অভ্যেস করেছি। কল-টেপা সুরের
গোলামি করি নি।

আমার দোষ হচ্ছে শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশি দিন
চালাতে পারে নি। ইচ্ছেমতো কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি

ভর্তি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত
তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাছিল্য করতে পারত
না। কেন-না সুযোগ ছিল বিস্তর। যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার
কর্তা ছিলেন সেজদাদা, ততদিন বিশ্বুর কাছে আন্মনাভাবে ব্ৰহ্মসং
গীত আউড়েছি। কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে
তখন গান আদায় করেছি দৱজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বেহাগে
আওড়াচ্ছেন ‘অতি-গজগামিনীরে’, আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার
ছাপ তুলে নিচ্ছি। সঙ্কেবেলায় মাকে সেই গান শুনিয়ে অবাক করা
খুব সহজ কাজ ছিল।

আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকৃষ্ণবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে
থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে শ্বান করতেন;
হাতে থাকত গুড়-গুড়ি, অস্তুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে; গুন-
গুন গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চার দিকে। তিনি তো গান
শেখাতেন না; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম
না। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে
বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল জ্বল
করত, গান ধরতেন—

‘ময় ছোড়েঁ ব্ৰজকী বাসৱী।’

সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।

তখনকার আতিথ্য ছিল খোলা দৱজার। চেনাশোনার, ঝঁজ-
খবর নেবার বিশেষ দৱকার ছিল না। যারা যখন এসে পড়ত তাদের
শোবার জায়গাও মিলত, অন্নের থালাও আসত যথানিয়মে। সেই
রকমের অচেনা অতিথি একদিন লেপ-মোড়া তস্তুরা কাঁখে ক'রে

তাঁর পুটুলি খুলে বসবার ঘরের এক পাশে পা ছড়িয়ে দিলেন। কানাই হঁকোবরদার যথারীতি তাঁর হাতে দিলে হঁকো তুলে। সেকালে ছিল অতিথির জন্যে এই যেমন তামাক, তেমনি পান। তখনকার দিনে বাড়ি-ভিতরে মেয়েদের সকাল বেলাকার কাজ ছিল এই— পান সাজতে হ'ত রাশি রাশি, বাইরের ঘরে যারা আসত তাদের উদ্দেশে। চটপট পানে চুন লাগিয়ে, কাঠি দিয়ে খয়ের লেপে, ঠিকমতো মসলা ভরে, লঙ্ঘ দিয়ে মুড়ে, সেগুলো বোঝাই হতে থাকত পিতলের গামলায়; উপরে পড়ত খয়েরের-ছোপ-লাগা ভিজে ন্যাকড়ার ঢাকা। ও দিকে বাইরে সিঁড়ির নীচের ঘরটাতে চলত তামাক সাজার ধূম। মাটির গামলায় ছাই-ঢাকা গুল, আলবোলার নলগুলো ঝুলছে নাগলোকের সাপের মতো, তাদের নাড়ীর মধ্যে গোলাপ-জলের গন্ধ। বাড়িতে যাঁরা আসতেন, সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখে তাঁরা গৃহস্থের প্রথম ‘আসুন মশায়’ ডাক পেতেন এই অস্বুরি তামাকের গন্ধে। তখন এই একটা বাঁধা নিয়ম ছিল মানুষকে মেনে নেওয়ার। সেই ভরপুর পানের গামলা অনেকদিন হল সরে পড়েছে। আর সেই হঁকোবরদার জাতটা সাজ খুলে ফেলে ময়রার দোকানে তিনি দিনের বাসি সন্দেশ চটকে চটকে মাখতে লেগেছে।

সেই অজানা গাইয়ে আপন ইচ্ছেমতো রয়ে গেলেন কিছুদিন। কেউ প্রশ্নও করলে না। ভোরবেলা মশারি থেকে টেনে বের করে তাঁর গান শুনতেম। নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই, তাদের শখ অনিয়মের শেখায়। সকালবেলার সূরে চলত— ‘বংশী হমারি রে’।

তার পরে যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন যদুভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন—

জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই। সেইজন্যে গান শেখাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে। ভালো লাগল কাফি সুরে 'রূম খুম বরখে আজু বাদরওয়া'; রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে। মুশকিল হল, এই সময়ে আর-এক অতিথি হাজির হল কিছু না বলে-কয়ে। বাঘ-মারা বলে তাঁর খ্যাতি। বাঙালি বাঘ মারে এ কথটা সেদিন শোনাত খুব অদ্ভুত; কাজেই বেশির ভাগ সময় আটকা পড়ে গেলুম তাঁরই ঘরে। যে বাঘের কবলে পড়েছিলেন বলে আমাদের বুকে চমক লাগিয়েছিলেন, সে বাঘের মুখ থেকে তিনি কামড় পান নি; কামড়ের গল্পটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন মিউজিয়মে মরা বাঘের হাঁ থেকে। তখন সে কথা ভাবি নি, এখন সেটা পষ্ট বুঝতে পারছি। তবু তখনকার মতো ঐ বীরপুরুষের জন্য ঘনঘন পান-তামাকের জোগাড় করতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। দূর থেকে কানে পেঁচত কানাড়ার আলাপ।

এই তো গেল গান। সেজদাদার হাতে আমার অন্য বিদ্যের যে গোড়াপত্তন হয়েছিল সেও খুব ফলাও রকমের। বিশেষ কিছু ফল হয় নি, সে স্বভাবদোষে। আমার মতো মানুষকে মনে রেখেই রামপ্রসাদ সেন বলেছিলেন, 'মন, তুমি কৃষিকাজ বোঝ না। কোনো দিন আবাদের কাজ করা হয় নি।'

চাষের আঁচড় কাটা হয়েছিল কোন্ কোন্ খেতে তার খবরটা দেওয়া যাক।

অঙ্ককার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি, কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে শিরু শিরু করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরে

এক ডাক্সাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান; সে আমাদের কুস্তি লড়াত। দালান-ঘরের উত্তর দিকে একটা ফাঁকা জমি, তাকে বলা হয় গোলাবাড়ি। নাম শুনে বোঝা যায় শহর একদিন পাড়াগাঁটাকে আগাগোড়া চাপা দিয়ে বসে নি, কিছু কিছু ফাঁক ছিল। শহরে সভ্যতার শুরুতে আমাদের গোলাবাড়ি গোলা ভ'রে বছরের ধান জমা করে রাখত, খাস জমির রায়তরা দিত তাদের ধানের ভাগ। এরই পাঁচিল ঘেঁষে ছিল কুস্তির চালাঘর। এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে মাটি আলগা ক'রে তাতে এক মোন সর্বের তেল ঢেলে জমি তৈরি হয়েছিল। সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে আমার প্যাচ কষা ছিল ছেলেখেলা মাত্র। খুব খানিকটা মাটি মাখামাখি ক'রে শেষকালে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে ঢেলে আসতুম। সকালবেলায় রোজ এত ক'রে মাটি ঘেঁটে আসা ভালো লাগত না মায়ের, তাঁর ভয় হ'ত ছেলের গায়ের রঙ মেটে হয়ে যায় পাছে। তার ফল হয়েছিল, ছুটির দিনে তিনি লেগে যেতেন শোধন করতে। এখনকার কালের শৌখিন গিনিরা রঙ সাফ করবার সরঞ্জাম কৌটোতে করে কিনে আনেন বিলিতি দোকান থেকে, তখন তাঁরা মলম বানাতেন নিজের হাতে। তাতে ছিল বাদাম-বাটা, সর, কমলালেবুর খোসা, আরো কত কী—যদি জানতুম আর মনে থাকত তবে বেগমবিলাস নাম দিয়ে ব্যাবসা করলে সন্দেশের দোকানের চেয়ে কম আয় হ'ত না। রবিবার দিন সকালে বারান্দায় বসিয়ে দলন-মলন চলতে থাকত; অস্তির হয়ে উঠত মন ছুটির জন্যে। এ দিকে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে একটা গুজব ঢেলে আসছে যে জন্মমাত্র আমাদের বাড়িতে শিশুদের ডুবিয়ে দেওয়া হয় মদের মধ্যে, তাতেই রঙটাতে সাহেবি জেঞ্চা লাগে।

কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র বসে আছেন মানুষের হাড় চেনাবার বিদ্যে শিখাবার জন্যে। দেয়ালে ঝুলছে আস্ত একটা কক্ষাল। রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের দেয়ালে এটা ঝুলত, হাওয়ায় নাড়া খেলে হাড়গুলো উঠত খট্ট খট্ট ক'রে। তাদের নাড়াচাড়া ক'রে ক'রে হাড়গুলোর শক্ত শক্ত নাম সব জানা হয়েছিল, তাতেই ভয় গিয়েছিল ভেঙে।

দেউড়িতে বাজল সাতটা। নীলকমল মাস্টারের ঘড়ি-ধরা সময় ছিল নিরেট; এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না। খট্টক্ষেতে রোগা শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ছাত্রেই মতো, একদিনের জন্যও মাথা-ধরার সুযোগ ঘটল না। বই নিয়ে, শ্লেট নিয়ে, যেতুম টেবিলের সামনে। কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে অক্ষের দাগ পড়তে থাকত, সবই বাংলায়— পাটিগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত। সাহিত্যে ‘সীতার বনবাস’ থেকে একদম চাঢ়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মেঘনাদবধ কাব্যে। সঙ্গে ছিল ‘প্রাকৃত বিজ্ঞান’। মাঝে মাঝে আসতেন সীতানাথ দত্ত, বিজ্ঞানের ভাসা-ভাসা খবর পাওয়া যেত জানা জিনিস পরখ করে। মাঝে একবার এলেন হেরম তত্ত্বরত্ন। লাগলুম কিছু না বুঝে ‘মুক্ষবোধ’ মুখস্থ করে ফেলতে। এমনি করে সারা সকাল জুড়ে নানা রকম পড়ার যতই চাপ পড়ে মন ততই ভিতরে ভিতরে চুরি ক'রে কিছু কিছু বোঝা সরাতে থাকে; জালের মধ্যে ফাঁক ক'রে তার ভিতর দিয়ে মুখস্থ বিদ্যে ফস্কিয়ে যেতে চায়; আর নীলকমল মাস্টার তাঁর ছাত্রের বুদ্ধি নিয়ে যে মত জারি করতে থাকেন তা বাইরের পাঁচজনকে দেকে দেকে শোনাবার মতো হয় না।

বারান্দার আর-এক ধারে বুড়ো দর্জি, চোখে আতশ কাঁচের

চশমা, ঝুঁকে পঁড়ে কাপড় সেলাই করছে, মাঝে মাঝে সময় হলে নমাজ পড়ে নিচ্ছে— চেয়ে দেখি আর ভাবি, কী সুবেই আছে নেয়ামৎ। অক কষতে মাথা যখন ঘুলিয়ে যায়, চোখের উপর শ্লেট আড়াল ক'রে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান লম্বা দাঢ়ি কাঠের কাঁকই দিয়ে আঁচড়িয়ে তুলছে দুই কানের উপর দুই ভাগে। পাশে বসে আছে কাঁকন-পরা ছিপছিপে ছোকরা দরোয়ান, কুটছে তামাক। এখানে ঘোড়াটা সঞ্চালনেই খেয়ে গেছে বালতিতে বরাদ্দ দানা, কাকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ঠোকরাছে ছিটয়ে-পড়া ছোলা, জনি কুকুরটার কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে— যেউ যেউ ক'রে দেয় তাড়া।

বারান্দায় এক কোণে ঝাঁট দিয়ে জমা করা ধূলোর মধ্যে পুঁতেছিলুম আতার বিচি। কবে তার থেকে কচি পাতা বেরোবে দেখবার জন্যে মন ছটফট করছে। নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই, আর দেওয়া চাই জল। শেষ পর্যন্ত আমার আশা মেটে নি। যে ঝাঁটা একদিন ধূলো জমিয়েছিল সেই ঝাঁটাই দিয়েছিল ধূলো উড়িয়ে।

সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় হেলে পড়ে ছায়া। নটা বাজে। বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান করাতে। সাড়ে নটা বাজতেই রোজকার বরাদ্দ ডাল, ভাত, মাছের বোলের বাঁধা ভোজ। রুচি হয় না খেতে।

ঘন্টা বাজে দশটার। বড়ো রাস্তা থেকে মন-উদাস-করা ডাক শোনা যায় কাঁচা-আম-ওয়ালার। বাসনওয়ালা ঠঁ ঠঁ আওয়াজ দিয়ে

চলছে দূরের থেকে দূরে। গলির ধারের বাড়ির ছাতে বড়োবড় ভিজে চুল শুকোছে রোদ্দুরে; তার দুই মেয়ে কড়ি নিয়ে খেলেই চলেছে, কোনো তাড়া নেই। মেয়েদের তখন ইস্কুল যাওয়ার তাগিদ ছিল না। মনে হ'ত মেয়ে-জন্মটা নিছক সুখের। বুড়ো ঘোড়া পাঞ্চ-গাড়িতে করে টেনে নিয়ে চলল আমার দশটা-চারটার আন্দামানে। সাড়ে চারটের পর ফিরে আসি ইস্কুল থেকে। জিম্নাস্টিকের মাস্টার এসেছেন। কাঠের ডাঙুর উপর ঘণ্টাখালেক ধরে শরীরটাকে উলট-পালট করি। তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছবি-আঁকার মাস্টার।

এংমে দিনের মরচে-পড়া আলো মিলিয়ে আসে। শহরের পাঁচমিশালি ঝাপসা শব্দে স্বপ্নের সুর লাগায় ইটকাঠের দৈত্যটার দেহে।

পড়ার ঘরে জুলে ওঠে তেলের বাতি। অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া। কালো কালো মলাটের রীড়ার যেন ওৎ পেতে রয়েছে টেবিলের উপর। মলাটটা ঢল্টলে; পাতাঙ্গলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগি; অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে, তার সবটাই ক্যাপিটল অক্ষর। পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি। যত পড়ি তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশি।

বিছানায় ঢুকে এতক্ষণ পরে পাওয়া যায় একটুখানি পোড়ো সময়। সেখানে শুনতে শুনতে শেষ হতে পায় না—

‘রাজপুত্র চলেছে তেপান্ত্র মাঠে’...

তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত ঘটেছে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারি, যখন দেখতে পাই আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে মানুষের আনাগোনা, না আছে ভূতপ্রেতের। পূর্বেই জানিয়েছি অত্যন্ত বেশি লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্য দিয়েছে দৌড়। ছাদের কার্ণিশে তার আরামের পা রাখবার গুজব উঠে গিয়ে সেখানে এঁঠো আমের আঁষ্ঠি নিয়ে কাকেদের চলেছে ছেঁড়াছেঁড়ি। এ দিকে মানুষের বসতি আটক পড়েছে নীচের তলায় চারকোণা দেওয়ালের প্যাক্বাঙ্গে।

মনে পড়ে বাড়ি-ভিতরের পাঁচিল-ঘেরা ছাদ। মা বসেছেন সঙ্কেবেলায় মাদুর পেতে, তাঁর সঙ্গিনীরা চার দিকে ঘিরে বসে গল্প করছে। সেই গল্পে খাঁটি খবরের দরকার ছিল না। দরকার কেবল সময় কাটানো। তখনকার দিনের সময় ভর্তি করবার জন্যে নানা দামের নানা মাল-মসলার বরাদ্দ ছিল না। দিন ছিল না ঠাসবুনুনি-করা, ছিল বড়ো-বড়ো-ফাঁক-ওয়ালা জালের মতো। পুরুষদের মজলিশেই হোক, আর মেয়েদের আসরেই হোক, গল্পগুজব হাসি-তামাসা ছিল খুবই হাস্কা দামের। মায়ের সঙ্গিনীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন বৃজ আচার্জির বোন, যাঁকে আচার্জিনী বলে ডাকা হ'ত। তিনি ছিলেন এ বৈঠকে দৈনিক খবর সরবরাহ করবার কাজে। প্রায় আনতেন রাজ্যের বিদ্রুটে খবর কুড়িয়ে কিংবা বানিয়ে। তাই নিয়ে গ্রহশাস্তি-স্বস্ত্যযন্তের হিসেব হ'ত খুব ফলাও খরচার। এই সভায় আমি মাঝে মাঝে টাটকা পুঁথি-পড়া বিদ্যের আমদানি করেছি; শুনিয়েছি সূর্য পৃথিবীর থেকে ন কোটি মাইল দূরে।

ঝজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে স্বয়ং বাল্মীকি-রামায়ণের টুকরো আউডে দিয়েছি অনুস্থার-বিসর্গ-সূন্দ। মা জানতেন না তাঁর ছেলের উচ্চারণ কত খাঁটি, তবু তার বিদ্যের পাঞ্চা সুর্যের ন কোটি মাইল রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ-সব শ্লোক স্বয়ং নারদ মুনি ছাড়া আর কারো মুখে শোনা যেতে পারে, এ কথা কে জানত বলো।

বাড়ি-ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে। ভাঁড়ারের সঙ্গে ছিল তার বোঝাপড়া। ওখানে রোদ পড়ত পুরোপুরি, জারক নেবুকে দিত জারিয়ে। ঐখানে মেয়েরা বসত পিতলের গামলা-ভরা কলাইবাটা নিয়ে। টিপে টিপে টপ্ টপ্ করে বড়ি দিত চুল শুকোতে শুকোতে। দাসীরা বাসি কাপড় কেচে মেলে দিয়ে যেত রোদ্দুরে। তখন অনেকটা হাস্কা ছিল ধোবার কাজ। কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি শুকোনো হ'ত, ছোটো বড়ো নানা সাইজের নানা-কাজ-করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হ'ত, রোদ-খাওয়া সর্বের তেলে ম'জে উঠত ইঁচড়ের আচার। কেয়াখয়ের তৈরি হ'ত সাবধানে, তার কথাটা আমার বেশি করে মনে রাখবার মানে আছে। যখন ইস্কুলের পঞ্জিৎ-মশায় আমাকে জানিয়ে দিলেন আমাদের বাড়ির কেয়াখয়েরের নাম তাঁর শোনা আছে, অর্থ বুঝতে শক্ত ঠেকল না। যা তাঁর শোনা আছে সেটা তাঁর জানা চাই। তাই বাড়ির সুনাম বজায় রাখবার জন্য মাঝে মাঝে লুকিয়ে ছাদে উঠে দুটো-একটা কেয়াখয়ের— কী বলব— ‘চুরি করতুম’ বলার চেয়ে বলা ভালো অপহরণ করতুম। কেন-না, রাজা-মহারাজারাও দরকার হলে, এমন-কি না হলেও, অপহরণ

করে থাকেন; আর যারা চুরি করে তাদের জেলে পাঠান, শূলে চড়ান। শীতের কাঁচা রৌদ্রে ছাদে বসে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় কাটাবার একটা দায় ছিল মেয়েদের। বাড়িতে আমি ছিলুম একমাত্র দেওর— বউদিদির আমসত্ত্ব পাহারা, তা ছাড়া আরো পাঁচ রকম খুচরো কাজের সাথি। পড়ে শোনাতুম ‘বঙ্গাধিপ-পরাজয়’। কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়ত ঝাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটবার। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতুম। আমার অন্য কোনো গুণ যে ছিল সে কথা কিছুতেই বউঠাকরুন মানতেন না, এমন-কি চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু, আমার সুপুরি-কাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না। তাতে সুপুরি কাটার কাজটা চলত খুব দৌড়-বেগে। উস্কিয়ে দেবার লোক না থাকাতে সরু করে সুপুরি কাটার হাত অনেকদিন থেকে অন্য সরু কাজে লাগিয়েছি।

ছাদে-মেলে-দেওয়া এই-সব মেয়েলি কাজে পাড়াগাঁয়ের একটা স্বাদ ছিল। এই কাজগুলো সেই সময়কার যখন বাড়িতে ছিল টেকিশাল, যখন হ'ত নাড়ু কোটা, যখন দাসীরা সঙ্কেবেলায় বসে উরুতের উপর সলতে পাকাত, আর প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকোড়ির নেমস্তন্ত্রে। রূপকথা আজকাল ছেলেরা মেয়েদের মুখ থেকে শুনতে পায় না, নিজে নিজে পড়ে ছাপানো বই থেকে। আচার চাটনি এখন কিনে আনতে হয় নতুন-বাজার থেকে— বোতলে ভরা, গালা দিয়ে ছিপিতে বন্ধ।

পাড়াগাঁয়ের আরো-একটি ছাপ ছিল চণ্ণীমণ্ডপে। ওইখানে গুরুমশায়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়া-প্রতিবেশীর

ছেলেদেরও ওইখানেই বিদ্যের প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায়। আমিও নিশ্চয় ওইখানেই স্বরে-অ-স্বরে-আ'র উপর দাগা বুলোতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সৌরলোকের সব চেয়ে দূরের প্রহের মতো সেই শিশুকে মনে-আনা-ওয়ালা কোনো দূরবীন দিয়েও তাকে দেখবার জো নেই।

তার পরে বই-পড়ার কথা প্রথম যা মনে পড়ে সে ষণামার্ক মুনির পাঠশালার বিষম ব্যাপার নিয়ে, আর হিরণ্যকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ অবতার— বোধ করি সীমের-ফলকে-খোদাই-করা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে। আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণক্যের শ্লোক :

আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ছেটো থেকে বড়ো বয়স পর্যন্ত আমার নানা রকমের দিন ওই ছাদে নানাভাবে বয়ে চলেছে। আমার পিতা যখন বাড়ি থাকতেন তাঁর জ্যায়গা ছিল তেতোলার ঘরে। চিলেকোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কত দিন দেখেছি, তখনো সূর্য ওঠে নি, তিনি সাদা পাথরের ঘূর্ণির মতো ছাদে চুপ করে বসে আছেন, কোলে দুটি হাত জোড়-করা। মাঝে মাঝে তিনি অনেকদিনের জন্য চলে যেতেন পাহাড়ে পর্বতে, তখন ওই ছাদে যাওয়া ছিল আমার সাত সমুদ্দুর-পারে যাওয়ার আনন্দ। চিরদিনের নীচে তলায় বারান্দায় বসে বসে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছি রাস্তার লোক-চলাচল; কিন্তু ঐ ছাদের উপর যাওয়া লোকবসতির পিল্পেগাড়ি পেরিয়ে যাওয়া। ওখানে গেলে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে মন চলে যায়— যেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ

সবুজে। নানা বাড়ির নানা গড়নের উঁচুনিচু ছাদ চোখে ঠেকে, মধ্যে
মধ্যে দেখা যায় গাছের ঝাঁকড়া মাথা। আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম
প্রায়ই দুপুর বেলায়। বরাবর এই দুপুর বেলাটা নিয়েছে আমার মন
ভুলিয়ে। ও যেন দিনের বেলাকার রাত্তির, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগি
হয়ে যাবার সময়! খড়খড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে ঘরের
ছিট্কিনি দিতুম খুলে। দরজার ঠিক সামনেই ছিল একটা সোফা;
সেইখানে অত্যন্ত একলা হয়ে বসতুম। আমাকে পাকড়া করবার
চৌকিদার যারা, পেট ভরে খেয়ে তাদের ঝিমুনি এসেছে; গা মোড়া
দিতে দিতে শুয়ে পড়েছে মাদুর জুড়ে।

রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর, চিল ডেকে যেত আকাশে। সামনের
গলি দিয়ে হেঁকে যেত চুড়িওয়ালা — সেদিনকার দুপুর বেলাকার
সেই চুপচাপ বেলা আজ আর নেই, আর নেই সেই চুপচাপ বেলার
ফেরিওয়ালা।—

হঠাতে তাদের হাঁক পৌছত, যেখানে বালিশের উপর খোলা চুল
এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকত বাড়ির বউ। দাসী ডেকে নিয়ে আসত
ভিতরে, বুড়ো চুড়িওয়ালা কচি হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিত
পছন্দমতো বেলোয়ারি চুড়ি। সেদিনকার সেই বউ আজকের দিনে
এখনো বউয়ের পদ পায় নি; সেকেন্দ ক্লাসে সে পড়া মুখস্থ করছে।
আর সেই চুড়িওয়ালা হয়তো আজ সেই গলিতেই বেড়াচ্ছে রিক্ষ
ঠেলে। ছাদটা ছিল আমার কেতাবে-পড়া মরুভূমি, ধৃ ধৃ করছে চার
দিক। গরম বাতাস হু হু করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে, আকাশের
নীল রঙ এসেছে ফিকে হয়ে।

এই ছাদের মরুভূমিতে তখন একটা ওয়েসিস দেখা দিয়েছিল।

আজকাল উপরের তলায় কলের জলের নাগাল নেই। তখন তেতুলার ঘরেও তার দৌড় ছিল। লুকিয়ে-ঢেকা নাবার ঘর, তাকে যেন বাংলাদেশের শিশু লিভিংস্টন এইমাত্র খুঁজে বের করলে। কল দিতুম খুলে, ধারাজল পড়ত সকল গায়ে। বিছানার একখানা চাদর নিয়ে গা মুছে সহজ মানুষ হয়ে বসতুম।

ছুটির দিনটা দেখতে দেখতে শেষের দিকে এসে পৌঁছল। নীচের দেউড়ির ঘণ্টায় বাজল চারটে। রবিবারের বিকেল বেলায় আকাশটা বিশ্রী রকমের মুখ বিগড়ে আছে। আসছে-সোমবারের হাঁকরা মুখের প্রহণ-লাগানো ছায়া তাকে গিলতে শুরু করেছে। নীচে এতক্ষণে পাহারা-এড়ানো ছেলের খোঁজ পড়ে গেছে।

এখন জলখাবারের সময়। এইটে ছিল ব্ৰজেশ্বরের একটা লাল-চিহ-দেওয়া দিনের ভাগ। জলখাবারের বাজার করা ছিল তারই জিম্মায়। তখনকার দিনে দোকানিরা ঘয়ের দামে শতকরা ত্রিশ-চালিশ টাকা হারে মুনফা রাখত না, গক্ষে স্বাদে জলখাবার তখনো বিষিয়ে ওঠে নি। যদি জুটে যেত কচুরি সিঙড়া, এমন-কি, আলুর দম, সেটা মুখে পুরতে সময় লাগত না। কিন্তু, যথাসময়ে ব্ৰজেশ্বর যখন তার বাঁকা ঘাড় আরো বাঁকিয়ে বলত ‘দেখো বাবু, আজ কী এনেছি’, প্রায় দেখা যেত কাগজের ঠোঙ্গায় চীনেবাদাম-ভাজা ! সেটাতে আমাদের যে ঝুঁচি ছিল না তা নয়, কিন্তু ওর দৰের মধ্যেই ছিল ওর আদর। কোনোদিন টুঁ শব্দ করি নি। এমন-কি, যেদিন তালপাতার ঠোঙ্গা থেকে বেরোত তিলে-গজা সেদিনও না।

দিনের আলো আসছে ঘোলা হয়ে। মন-খারাপ নিয়ে একবার ছাদটা ঘুরে আসা গেল, নীচের দিকে দেখলুম তাকিয়ে— পুকুর

থেকে পাতিহাঁসগুলো উঠে গিয়েছে। লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে ঘাটে, বট গাছের ছায়া পড়েছে অর্ধেক পুরু জুড়ে, রাস্তা থেকে জুড়িগাড়ির সইসের হাঁক শোনা যাচ্ছে।

৯

দিনগুলো এমনি চলে যায় একটানা। দিনের মাঝখানটা ইস্কুল নেয় খাবলিয়ে, সকালে বিকেলে ছিটকিয়ে পড়ে তারই বাড়ির ভাগ। ঘরে চুকতেই ক্লাসের বেঞ্চ-টেবিলগুলো মনের মধ্যে যেন শুকনো কনুইয়ের গুঁতো মারে। রোজই তাদের একই আড়ষ্ট চেহারা।

সঙ্কেবেলায় ফিরে যেতুম বাড়িতে। ইস্কুল-ঘরে তেলের বাতিটা তুলে ধরেছে পরদিনের পড়া-তৈরি পথের সিগন্যাল। এক-একদিন বাড়ির আঙিনায় আসে ভালুক-নাচ-ওয়ালা। আসে সাপুড়ে সাপ খেলাতে। এক-একদিন আসে ভোজবাজিওয়ালা, একটু দেয় নতুনের আমেজ। আমাদের চিৎপুর রোডে আজ আর ওদের ডুগডুগি বাজে না। সিনেমাকে দূর থেকে সেলাম করে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।— শুকনো পাতার সঙ্গে এক জাতের ফড়িঙ যেমন বেমালুম রঙ মিলিয়ে থাকে, আমার প্রাণটা তেমনি শুকনো দিনের সঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে মিলিয়ে থাকত।

তখন খেলা ছিল সামান্য কয়েক বর্কমের। ছিল মার্বেল, ছিল যাকে বলে ব্যাটবল— ক্রিকেটের অত্যন্ত দূর কুটুম্ব। আর ছিল লাঠিম ঘোরানো, ঘুড়ি ওড়ানো। শহরে ছেলেদের খেলা সবই ছিল এমনি কমজোরি। মাঠ-জোড়া ফুটবল খেলার লম্ফব্যাম্প তখনো

ছিল সমুদ্রপারে। এমনি করে একই মাপের দিনগুলো শুকনো খুঁটির বেড়া পুঁতে চলেছিল আমাকে পাকে পাকে ঘিরে।

এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বউ, কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ।

দুই মহলে বাড়ি তখন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেয়েরা ভিতর-কোঠায়। নবাবি কায়দা তখনো চলে আসছে। মনে আছে, দিদি বেড়াছিলেন ছাদের উপর নতুন বউকে পাশে নিয়ে, মনের কথা বলাবলি চলছিল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধর্মক। এ পাড়া যে ছেলেদের দাগ-কাটা গণ্ডির বাইরের। আবার শুকনো মুখ করে ফিরতে হবে সেই ছ্যাংলাপড়া পুরোনো দিনের আড়ালে।

হঠাতে দূর পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে সাবেক রাঁধের তলা খইয়ে দেয়, এবার তাই ঘটল।— বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কর্তৃ। বউঠাকুরনের জায়গা হল বাড়ি-ভিতরের ছাদের লাগা ও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে। নেমন্তন্ত্রের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমানুষ। বউঠাকুর রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন; এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ।

চিংড়িমাছের চিংড়ির সঙ্গে পান্তা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প
একটু লক্ষার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে মাঝে
যখন আঘীয়-বাড়িতে যেতেন, ঘরের সামনে তাঁর চটিজুতো-জোড়া
দেখতে পেতুম না, তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা-কোনো
দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্রন করতুম। বলতে হ'ত,
'তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে? আমি কি চৌকিদার!'

তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন, 'তোমাকে আর ঘর সামলাতে
হবে না, নিজের হাত সামলিয়ো।'

এ কালের মেয়েদের হাসি পাবে; তাঁরা বলবেন নিজের ছাড়া
সংসারে কি পরের দেওর ছিল না কোনোখানে? কথাটা মানি।
এখনকার কালের বয়স সকলদিকেই তখনকার থেকে হঠাতে অনেক
বেড়ে গিয়েছে। তখন বড়ো ছোটো সবাই ছিল ছেলেমানুষ।

এইবার আমার নির্জন বেদুয়িনি ছাদে শুরু হল আর-এক
পালা— এল মানুষের সঙ্গ, মানুষের স্নেহ। সেই পালা জমিয়ে
দিলেন আমার জ্যোতিদাদা।

১০

ছাদের রাজ্যে নতুন হাওয়া বইল, নামল নতুন খতু।

তখন পিতৃদেব জোড়াসাঁকোয় বাস ছেড়েছিলেন। জ্যোতিদাদা
এসে বসলেন বাইরের তেতলার ঘরে। আমি একটু জায়গা নিলুম
তারই একটি কোণে।

অন্দরমহলের পর্দা রইল না। আজ এ কথা নতুন ঠেকবে না,

কিন্তু তখন এত নতুন ছিল যে মেপে দেখলে তার থই পাওয়া যায় না। তারও অনেককাল আগে, আমি তখন শিশু, মেজদাদা সিভিলিয়ন হয়ে দেশে ফিরেছেন। বোমাইয়ে প্রথম তাঁর কাজে যোগ দিতে যাবার সময় বাইরের লোকদের অবাক করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বউঠাকুরুকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়ির বউকে পরিবারের মধ্যে না রেখে দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়া এই তো ছিল যথেষ্ট, তার উপরে যাবার পথে ঢাকাঢাকি নেই— এ যে হল বিষম বেদস্ত্র। আপন লোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

বাইরে বেরোবার মতো কাপড় তখনো মেয়েদের মধ্যে চলতি হয় নি। এখন শাড়ি জামা নিয়ে যে সাজের চলন হয়েছে, তারই প্রথম শুরু করেছিলেন বউঠাকুরুন।

বেণী দুলিয়ে তখনো ফ্রক ধরে নি ছোটো মেয়েরা— অন্তত আমাদের বাড়িতে। ছোটোদের মধ্যে চলন ছিল পেশোয়াজের। বেথুন ইঙ্গুল যখন প্রথম খোলা হল, আমার বড়দিদির ছিল অল্প বয়স। সেখানে মেয়েদের পড়াশোনার পথ সহজ করবার প্রথম দলের ছিলেন তিনি! ধ্বনিবে তাঁর রঙ। এ দেশে তার তুলনা পাওয়া যেত না। শুনেছি পাক্ষিতে করে স্কুলে যাবার সময় পেশোয়াজ-পরা তাঁকে চুরি-করা ইংরেজ মেয়ে মনে করে পুলিসে একবার ধরেছিল।

আগেই বলেছি সেকালে বড়ো-ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকেটা ছিল না। কিন্তু এই-সকল পুরোনো কায়দার ভিত্তির মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোটো। বয়সের এত দূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম, এই আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য এই যে, তাঁর সঙ্গে আলাপে

জ্যাঠামি ব'লে কখনো আমার মুখ চাপা দেন নি। তাই কোনো কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলোন হয় নি। আজ ছেলেদের মধ্যেই আমার বাস। পাঁচ-রকম কথা পাড়ি, দেখি তাদের মুখ বোজা। জিজ্ঞেসা করতে এদের বাধে। বুঝতে পারি এরা সব সেই বুড়োদের কালের ছেলে যে কালে বড়োরা কইত কথা আর ছেটোরা থাকত বোবা। জিজ্ঞাসা করবার সাহস নতুন কালের ছেলেদের; আর বুড়োকালের ছেলেরা সব-কিছু মেনে নেয় ঘাড় গুঁজে।

ছাদের ঘরে এল পিয়ানো। আর এল একালের বার্নিশ-করা বউবাজারের আসবাব। বুকের ছাতি উঠল ফুলে। গরিবের চোখে দেখা দিল হাল আমলের সস্তা আমিরি।

এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম্ সুর তৈরি করে যেতেন; আমাকে রাখতেন পাশে। তখনই-তখনই সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।

দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রংপোর রেকাবিতে বেলফুলের গোড়েমালা ভিজে রংমালে, পিরিচে এক-গ্লাস বরফ-দেওয়া জল, আর বাটাতে ছাঁচিপান।

বউঠাকরুন গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা; বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনো তা ফিরিয়ে নেন নি। সূর্য-ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হ হ ক'রে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভ'রে।

ছাদটাকে বউঠাকরন একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিল্লের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ; আশেপাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলনচাঁপা। ছাদ-জখমের কথা মনেই আনেন নি, সবাই ছিলেন খেয়ালি।

প্রায় আসতেন অক্ষয় চৌধুরী। তাঁর গলায় সূর ছিল না সে কথা তিনিও জানতেন, অন্যেরা আরো বেশি জানত। কিন্তু তাঁর গাবার জেদ কিছুতে থামত না। বিশেষ করে বেহাগ রাগিণীতে ছিল তাঁর শখ। চোখ বুজে গাইতেন, যারা শুনত তাদের মুখের ভাব দেখতে পেতেন না। হাতের কাছে আওয়াজওয়ালা কিছু পেলেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে পটাপট শব্দে তাকেই বাঁয়া-তবলার বদলি করে নিতেন। মলাট-বাঁধানো বই থাকলে ভালোই চলত। ভাবে ভোর মানুষ; তাঁর ছুটির দিনের সঙ্গে কাজের দিনের তফাত বোঝা যেত না।

সর্বোবেলার সভা যেত ভেঙে। আমি চিরকাল ছিলুম রাত জাগিয়ে ছেলে। সকলে শুতে যেত, আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম ব্ৰহ্মদত্তিৰ চেলা। সমস্ত পাড়া চৃপচাপ। চাঁদনি রাতে ছাদের উপর সারি সারি গাছের ছায়া যেন স্বপ্নের আলপনা। ছাদের বাইরে সিসু গাছের মাথাটা বাতাসে দুলে উঠছে, ঝিল্মিল করছে পাতাগুলো। জানি নে কেন সব চেয়ে চোখে পড়ত সামনের গলিৰ ঘুমস্ত বাড়িৰ ছাদে একটা ঢালু-পিঠ-ওয়ালা বেঁটে চিলেকোঠা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিসেৰ দিকে যেন আঙুল বাড়িয়ে রয়েছে।

রাত একটা হয়, দুটো হয়। সামনেৰ বড়ো রাস্তায় রব ওঠে—
‘বলো হরি! হবিবোল!’

খাঁচায় পাখি পোষার শখ তখন ঘরে ঘরে ছিল। সব চেয়ে খারাপ লাগত পাড়ায় কোনো বাড়ি থেকে পিঁজরেতে-বাঁধা কোকিলের ডাক। বউঠাকুরুন জোগাড় করেছিলেন চীনদেশের এক শ্যামা পাখি। কাপড়ের ঢাকার ভিতর থেকে তার শিষ উঠত ফোয়ারার মতো। আরো ছিল নানা জাতের পাখি, তাদের খাঁচাগুলো ঝুলত পশ্চিমের বারান্দায়। রোজ সকালে একজন পোকাওয়ালা পাখিদের খাবার জোগাত। তার ঝুলি থেকে বেরোত ফড়ঙ, ছাতুখোর পাখিদের জন্যে ছাতু।

জ্যোতিদাদা আমার সকল তর্কের জবাব দিতেন। কিন্তু মেয়েদের কাছে এতটা আশা করা যায় না। একবার বউঠাকুরুনের মর্জি হয়েছিল খাঁচায় কাঠবিড়ালি পোষা। আমি বলেছিলুম কাজটা অন্যায় হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন শুরুমশায়গিরি করতে হবে না। একে ঠিক জবাব বলা চলে না। কাজেই কথা-কাটাকাটির বদলে লুকিয়ে দুটি প্রাণীকে ছেড়ে দিতে হল। তার পরেও কিছু কথা শুনেছিলুম, কোনো জবাব করি নি।

আমাদের মধ্যে একটা বাঁধা ঝগড়া ছিল, কোনোদিন যার শেষ হল না। সে কথা বলছি।—

উমেশ ছিল চালাক লোক। বিলিতি দর্জির দোকান থেকে যত-সব ছাঁটাকাটা নানা রঙের রেশমের ফালি জলের দরে কিনে আনত, তার সঙ্গে নেটের টুকরো আর খেলো লেস মিলিয়ে মেয়েদের জামা বানানো হত। কাগজের প্যাকেট খুলে সাবধানে মেলে ধরত মেয়েদের চেয়ে; বলত এই হচ্ছে আজকের দিনের ফ্যাশন। ঐ

মন্ত্রটার টান মেয়েরা সামলাতে পারত না। আমাকে কী দুঃখ দিত বলতে পারি নে। বার বার অস্থির হয়ে আপত্তি জানিয়েছি। জবাবে শুনেছি— জ্যাঠামি করতে হবে না। আমি বউঠাকরুনকে জানিয়েছি এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক ভদ্র, সেকেলে সাদা কালাপেড়ে শাড়ি কিংবা ঢাকাই।— আমি ভাবি, আজকালকার জর্জেট-জড়ানো বউদিদীরের রঙ-করা পুতুল-গড়া রূপ দেখে দেওরদের মুখে কি কোনো কথা সরছে না। উমেশের-সেলাই-করা ঢাকনি-পরা বউঠাকরুন যে ছিলেন ভালো। চেহারার উপর এত বেশি জালিয়াতি তখন ছিল না।

তর্কে বউঠাকরুনের কাছে বরাবর হেরেছি, কেন-না তিনি তর্কের জবাব দিতেন না। আর হেরেছি দাবাখেলায়, সে খেলায় তাঁর হাত ছিল পাকা।

জ্যোতিদাদার কথা যখন উঠে পড়েছে তখন তাঁকে ভালো করে চিনিয়ে দিতে আরো কিছু বলার দরকার হবে। শুরু করতে হবে আরো একটু আগেকার দিনে।

জমিদারির কাজ দেখতে প্রায় তাঁকে যেতে হ'ত শিলাইদহে। একবার যখন সেই দরকারে বেরিয়েছিলেন, আমাকেও নিয়েছিলেন সঙ্গে। তখনকার পক্ষে ওটা ছিল বেদস্ত্র, অর্থাৎ যাকে লোকে বলতে পারত ‘বাড়াবাড়ি হচ্ছে’। তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন— ঘর থেকে এই বাইরে চলাচল এ একটা চলতি ক্লাসের মতো। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন আমার ছিল আকাশে বাতাসে চরে-বেড়ানো মন, সেখান থেকে আমি খোরাক পাই আপনা হতেই। তার কিছুকাল

পরে জীবনটা যখন আরো উপরের ক্লাসে উঠেছিল, আমি মানুষ হচ্ছিলুম এই শিলাইদহে।

পুরোনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দূরে। নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড়ো বড়ো ঝাউ গাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবের ব্যাবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। আজ কুঠিয়াল সাহেবের দাববাব একেবাবে থম্ থম্ করছে। কোথায় নীলকুঠির যমের দৃত সেই দেওয়ান! কোথায় লাঠি-কাঁধে কোমর-বাঁধা পেয়াদার দল! কোথায় লস্বা-টেবিল-পাতা খানার ঘর— যেখানে ঘোড়ায় চড়ে সদর থেকে সাহেবরা এসে রাতকে দিন করে দিত, ভোজের সঙ্গে চলত জুড়ি-নৃত্যের ঘূর্ণিপাক, রক্তে ফুটতে থাকত শ্যাম্পেনের নেশা! হতভাগা রায়তদের দোহাইপাড়া কান্না উপরওয়ালাদের কানে পৌঁছত না, সদর জেলখানা পর্যন্ত তাদের শাসনের পথ লস্বা হয়ে চলত। সেদিনকার আর যা-কিছু সব মিথ্যে হয়ে গেছে, কেবল সত্য হয়ে আছে দুই সাহেবের দুটি গোর। লস্বা লস্বা ঝাউ গাছগুলি দোলাদুলি করে বাতাসে আর সেদিনকার রায়তদের নাতি-নাতনিরা কখনো কখনো দুপুর রাত্রে দেখতে পায় সাহেবের ভূত বেড়াচ্ছে কুঠিবাড়ির পোড়ো বাগানে।

একলা থাকার মন নিয়ে আছি। ছোটো একটি কোণের ঘর, যত বড়ো ঢালা ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি। অজানা ভিন্ন দেশের ছুটি, পুরোনো দিঘির কালো জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা-কও ডাকছে তো ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই। এই সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতা ভরে উঠতে আরম্ভ করেছে

পদ্যে। সেগুলো যেন বারে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফলনের আমের বোল— ঝরেও গেছে।

তখনকার দিনে অন্ন বয়সের ছেলে, বিশেষত মেয়ে, যদি অক্ষর গুণে দু-চতুর্থ পদ্য লিখত তা হলে দেশের সমজদাররা ভাবত এমন যেন আর হয় না, কখনো হবে না। সে-সব মেয়ে-কবিদের নাম দেখেছি, কাগজে তাদের লেখাও বেরিয়েছে। তার পরে সেই অতি সাবধানে চোদ্দ অক্ষর বাঁচিয়ে লেখা ভালো ভালো কথা আর কাঁচা কাঁচা মিল যেই গেল মিলিয়ে, অমনি তাদের সেই নাম-মোছা পটে আজকালকার মেয়েদের সারি সারি নাম উঠছে ফুটে।

ছেলেদের সাহস মেয়েদের চেয়ে অনেক কম, লজ্জা অনেক বেশি। সেদিন ছেটো বয়সের ছেলে-কবি কবিতা লিখেছে মনে পড়ে না, এক আমি ছাড়া। আমার চেয়ে বড়ো বয়সের এক ভাগনে একদিন বাতলিয়ে দিলেন চোদ্দ অক্ষরের ছাঁচে কথা ঢাললে সেটা জমে ওঠে পদ্যে। স্বয়ং দেখলুম এই জাদুবিদ্যের ব্যাপার। আর, হাতে হাতে সেই চোদ্দ অক্ষরের ছাঁদে পদ্মও ফুটল; এমন-কি, তার উপরে ভ্রমরও বসবার জায়গা পেল। কবিদের সঙ্গে আমার তফাত গেল ঘুচে, সেই অবধি এই তফাত ঘুচিয়েই চলেছি।

মনে আছে— ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাসে যখন পড়ি সুপারিন-টেল্ডেন্ট গোবিন্দবাবু গুজব শুনলেন যে, আমি কবিতা লিখি। আমাকে ফর্মাশ করলেন লিখতে; ভাবলেন নর্মাল স্কুলের নাম উঠবে ভ্লজ্বলিয়ে। লিখতে হল, শোনাতেও হল ক্লাসের ছেলেদের, শুনতে হল যে এ লেখাটা নিশ্চয় চুরি। নিন্দুকরা জানতে পারে নি, তার পরে যখন সেয়ানা হয়েছি তখন ভাবচুরিতে হাত পাকিয়েছি।

কিন্তু এ চোরাই মালগুলো দামি জিনিস।

মনে পড়ে পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম; তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে, সাঁতার দিয়ে পদ্ম তুলতে গিয়ে নিজের হাতের ঢেউয়ে পদ্মটা সরে সরে যায়, তাকে ধরা যায় না। অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিয়ে বেড়ালেন। আত্মীয়রা বললেন— ছেলেটির লেখবার হাত আছে।

বউঠাকরনের ব্যবহার ছিল উল্টো। কোনো কালে আমি যে লিখিয়ে হব, এ তিনি কিছুতেই মানতেন না। কেবলই খোঁটা দিয়ে বলতেন কোনো কালে বিহারী চক্ৰবৰ্তীৰ মতো লিখতে পারব না। আমি মন-মরা হয়ে ভাবতুম তাঁর চেয়ে অনেক নীচের ধাপের মার্কা যদি মিলত, তা হলে মেয়েদের সাজ নিয়ে তাঁর খুদে দেওর কবির অপচূন্দ অমন করে উড়িয়ে দিতে তাঁর বাধত।

জ্যোতিদাদা ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসতেন। বউঠাকরনকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে চিংপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন, এমন ঘটনাও সেদিন ঘটেছিল। শিলাইদহে আমাকে দিলেন এক টাটুঘোড়া। সে জস্তো কম দৌড়বাজ ছিল না। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন রথতলার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে। সেই এবড়োখেবড়ো মাঠে পড়ি-পড়ি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে আনতুম। আমি পড়ব না, তাঁর মনে এই জোর ছিল বলৈই আমি পড়ি নি। কিছুকাল পরে কলকাতার রাস্তাতেও আমাকে ঘোড়ায় চড়িয়েছিলেন। সে টাটু নয়, বেশ মেজাজি ঘোড়া। একদিন সে আমাকে পিঠে নিয়ে

দেউড়ির ভিতর দিয়ে সোজা ছুটে গিয়েছিল উঠোনে, যেখানে সে দানা খেত। পরদিন থেকে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

বন্দুক ছেঁড়া জ্যোতিদাদা কস্ত করেছিলেন, সে কথা পূর্বেই জানিয়েছি। বাঘ-শিকারের ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে। বিশ্বনাথ শিকারী একদিন খবর দিল শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এসেছে। তখনই বন্দুক বাগিয়ে তিনি তৈরি হলেন। আশ্চর্যের কথা এই আমাকেও নিলেন সঙ্গে। একটা মুশকিল কিছু ঘটতে পারে, এ যেন তাঁর ভাবনার মধ্যেই ছিল না।

ওস্তাদ শিকারী ছিল বটে বিশ্বনাথ। সে জানত মাচানের উপর থেকে শিকার করাটা মরদের কাজ নয়। বাঘকে সামনে ডাক দিয়ে লাগাত গুলি। একবারও ফসকায় নি তার তাক।

মন জগল। সেরকম জগলের ছায়াতে আলোতে বাঘ চোখেই পড়তে চায় না। একটা মোটা বাঁশ গাছের গায়ে কক্ষি কেটে কেটে মহিয়ের মতো বানানো হয়েছে। জ্যোতিদাদা উঠলেন বন্দুক হাতে। আমার পায়ে জুতোও নেই— বাঘটা তাড়া করলে তাকে যে জুতো-পেটা করব তারও উপায় ছিল না। বিশ্বনাথ ইশারা করলে। জ্যোতিদাদা অনেকক্ষণ দেখতেই পান না। তাকিয়ে তাকিয়ে শেষকালে ঝোপের মধ্যে বাঘের গায়ের একটা দাগ তাঁর চশমা-পরা চোখে পড়ল। মারলেন গুলি। দৈবাং লাগল সেটা তার শিরদাঁড়ায়। সে আর উঠতে পারল না। কাঠকুঠো যা সামনে পায় কামড়ে ধরে লেজ আছড়ে ভীষণ গর্জাতে লাগল। ভেবে দেখলে মনে সন্দেহ লাগে। অতক্ষণ ধরে বাঘটা মরবার জন্যে সবুর করে ছিল, সেটা ওদের মেজাজে নেই বলৈই জানি। তাকে আগের রাত্রে তার খাবার সঙ্গে

ফিকির করে আফিম লাগায় নি তো ! এত ঘুম কেন !

আরো একবার বাঘ এসেছিল শিলাইদহের জঙ্গলে। আমরা দুই ভাই যাত্রা করলুম তার খৌজে হাতির পিঠে চড়ে। আথের খেত থেকে পট পট করে আখ উপড়িয়ে চিবোতে চিবোতে পিঠে ভূমিকম্প লাগিয়ে চলল হাতি, ভারিকি চালে। সামনে এসে পড়ল বন। হাঁটু দিয়ে চেপে, শুঁড় দিয়ে টেনে, গাছগুলোকে পেড়ে ফেলতে লাগল মাটিতে। তার আগেই বিশ্বনাথের ভাই চামরুর কাছে গল্প শুনেছিলুম— সর্বনেশে ব্যাপার হয় বাঘ যখন লাফ দিয়ে হাতির পিঠে চড়ে থাবা বসিয়ে ধরে। তখন হাতি গাঁ গাঁ শব্দে ছুটতে থাকে বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, পিঠে যারা থাকে গুঁড়ির ধাক্কায় তাদের হাত-পা-মাথার হিসেব পাওয়া যায় না। সেদিন হাতির উপর চড়ে বসে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে ছিল ঐ হাড়গোড় ভাঙ্গার ছবি। ভয় করাটা চেপে বাখলুম লজ্জায়। বেগরোয়া ভাব দেখিয়ে চাইতে লাগলুম এ দিকে, ও দিকে। যেন বাঘটাকে একবার দেখতে পেলে হয়। তুকে পড়ল হাতি ঘন জঙ্গলের মধ্যে। এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। মাহত তাকে চেতিয়ে তোলবার চেষ্টাও করল না। দুই শিকারী প্রাণীর মধ্যে বাঘের 'পরেই তার বিশ্বাস ছিল বেশি। জ্যোতিদাদা বাঘটাকে ঘায়েল করে মরিয়া করে তুলবেন, নিশ্চয় এটাই ছিল তার সব চেয়ে ভাবনার কথা। হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ। যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রওয়ালা ঝড়ের ঝাপটা। আমাদের বিড়াল কুকুর শেঞ্চাল -দেখা নজর, এ যে ঘাড়-গর্দানে একটা একরাশ মুরদ, অথচ তার ভার নেই যেন। খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে দুপুরবেলার রোদ্রে চলল সে দৌড়ে। কী সুন্দর

সহজ চলনের বেগ! মাঠে ফসল ছিল না। ছুট্টি বাঘকে ভরপুর ক'রে দেখবার জায়গা এই বটে, সেই রৌদ্রতালা হলদে রঙের প্রকাণ মাঠ।

আর-একটা কথা বাকি আছে, শুনতে মজা লাগতে পারে। শিলাইদহে মালী ফুল তুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিত। আমার মাথায় খেয়াল গেল ফুলের রঙিন রস দিয়ে কবিতা লিখতে। টিপে টিপে যে রসটুকু পাওয়া যায় সে কলমের মুখে উঠতে চায় না। ভাবতে লাগলুম একটা কল তৈরি করা চাই। ছেঁড়াওয়ালা একটা কাঠের বাটি আর তার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালাবার মতো একটা হামান্দিস্তের নোড়া হলেই চলবে। সেটা ঘোরানো যাবে দড়িতে বাঁধা একটা চাকায়। জ্যোতিদাদাকে দরবার জানালুম। হয়তো মনে মনে তিনি হাসলেন, বাইরে সেটা ধরা পড়ল না। হ্রস্ব করলেন, ছুতোর এল কাঠ-কোঠ নিয়ে। কল তৈরি হল। ফুল-ভরা কাঠের বাটিতে দড়িতে-বাঁধা নোড়া যতই ঘোরাতে থাকি ফুলপিষ্টে কাদা হয়ে যায়, রস বেরোয় না। জ্যোতিদাদা দেখলেন, ফুলের রস আর কলের চাপে ছদ মিলল না। তবু আমার মুখের উপর হেসে উঠলেন না।

জীবনে এই একবার এঞ্জিনিয়ারি করতে নেবেছিলুম। যে যা নয় নিজেকে তাই যখন কেউ ভাবে, তার মাথা হেঁট করে দেবার এক দেবতা তৈরি থাকেন শাস্ত্রে এমন কথা আছে। সেই দেবতা সেদিন আমার এঞ্জিনিয়ারির দিকে কটাক্ষ করেছিলেন; তার পর থেকে যন্ত্রে হাত লাগানো আমার বন্ধ, এমন-কি সেতারে এস্রাজেও তার চড়াই নি।

জীবনশৃঙ্খিতে লিখেছি ফ্রান্টিলা কোম্পানির সঙ্গে পান্না দিয়ে বাংলাদেশের নদীতে স্বদেশী জাহাজ চালাতে গিয়ে কী করে জ্যোতিদাদা নিজেকে ফতুর করে দিলেন। বউঠাকরুনের মৃত্যু হয়েছে তার আগেই। জ্যোতিদাদা তাঁর তেতোলার বাসা ভেঙে চলে গেলেন। শেষকালে বাড়ি বানালেন রাঁচির এক পাহাড়ের উপর।

১২

এইবার তেতোলাঘরের আর-এক পালা আরম্ভ হল আমার সংসার নিয়ে।

একদিন গোলাবাড়ি পাঞ্চি আর তেতোলার ছাদের খালি ঘরে আমার ছিল যেন বেদের বাসা, কখনো এখানে, কখনো ওখানে। বউঠাকরুন এলেন, ছাদের ঘরে বাগান দিল দেখা। উপরের ঘরে এল পিয়ানো, নতুন নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটল।

পূর্বদিকের চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কফি খাওয়ার সরঞ্জাম হ'ত সকালে। সেই সময়ে পড়ে শোনাতেন তাঁর কোনো-একটা নতুন নাটকের প্রথম খসড়া। তার মধ্যে কখনো কখনো কিছু জুড়ে দেবার জন্যে আমাকেও ডাক পড়ত আমার অত্যন্ত কঁচা হাতের লাইনের জন্যে। ক্রমে রোদ এগিয়ে আসত— কাকগুলো ডাকাডাকি করত উপরের ছাদে বসে রুটির টুকরোর 'পরে লক্ষ করে। দশটা বাজলে ছায়া যেত ক্ষয়ে, ছাতটা উঠত তেতে।

দুপুরবেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নৌচের তলায় কাছারিতে। বউঠাকরুন ফলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে যত্ন করে রূপোর

রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিষ্টান্ন কিছু-কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপরে ছড়ানো হ'ত গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা ফলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে-ঠাণ্ডা-করা। সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের ঝুমাল ঢেকে মোরাদাবাদি খুঁক্ষেতে করে জলখাবার বেলা একটা-দুটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে।

তখন 'বন্দদর্শন'-এর ধূম লেগেছে— সূর্যমুখী আর কুণ্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল, কী হবে, দেশসুন্দৰ সবার এই ভাবনা।

'বন্দদর্শন' এলে পাড়ায় দুপুরবেলায় কারো ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হ'ত না; কেন-না, আমার একটা গুণ ছিল— আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বউঠাকরুন ভালোবাসতেন। তখন বিজ্লিপাখা ছিল না, পড়তে পড়তে বউঠাকরুনের হাতপাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।

১৩

মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা যেতেন হাওয়া বদল করতে গঙ্গার ধারের বাগানে। বিলিতি সওদাগরির ছেঁওয়া লেগে গঙ্গার ধার তখনো জাত খোওয়ায় নি। মুষড়ে যায় নি তার দুই ধারে পাখির বাসা; আকাশের আলোয় লোহার কলের শুঁড়গুলো ফুঁয়ে দেয় নি কালো নিশ্বাস।

গঙ্গার ধারের প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে, ছোটো সে দোতলা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্নেতের উপর টেউ খেলিয়ে; মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে ও পারে বনের মাথায়। অনেকবার এইরকম দিনে নিজে গান তৈরি করেছি, সেদিন তা হল না। বিদ্যাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর।

নিজের সুর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেরে তাকে নিজের করে নিলুম। গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে করা এই বাদলদিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিদ্ধুকটাতে। মনে পড়ে—
থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেধে গেছে ডালে-পালায়, ডিঙি নৌকাগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে, টেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপর। বউঠাকরুন ফিরে এলেন, গান শোনালুম তাঁকে; ভালো লাগল বলেন নি, চুপ করে শুনলেন। তখন আমার বয়স হবে ঘোলো কি সতরো। যা-তা তর্ক নিয়ে কথা কাটাকাটি তখনো চলে, কিন্তু ঝাঁজ করে গিয়েছে।

তার কিছু দিন পরে বাসা বদল করা হল মোরান-সাহেবের বাগানে। সেটা রাজবাড়ি বললেই হয়। রঙিন কাঁচের জানলা-দেওয়া উচু-নিচু ঘর; মার্বল পাথরে বাঁধা মেজে; ধাপে ধাপে গঙ্গার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায়। ঐখানে রাত জাগবার ঘোর লাগত আমার মনে; সেই সাবরমতী নদীর ধারের পায়চারির সঙ্গে

এখানকার পায়চারির তাল মেলানো চলত। সে বাগান আজ আর নেই, লোহার দাঁত কড়মড়িয়ে তাকে গিলে ফেলেছে ডাণ্ডির কারখানা।

ঐ মোরান-বাগানের কথায় মনে পড়ে— এক-একদিন রান্নার আয়োজন বকুলগাছ-তলায়। সে রান্নায় মসলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের শুণ। মনে পড়ে পইতের সময় বউঠাকুন আমাদের দুই ভাইয়ের হিংস্যান রেঁধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিনি দিন তার স্বাদে, তার গন্ধে, মুঝ করে রেখেছিল লোভীদের।

আমার একটা বড়ো মুশকিল ছিল— শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না। বাড়ির আর-আর যে-সব ছেলে রোগে পড়তে জানত তারা পেত তাঁর হাতের সেবা। তারা শুধু যে তাঁর সেবা পেত তা নয়, তাঁর সময় জুড়ে বসত। আমার ভাগ যেত কমে।

সেদিনকার সেই তেতালার দিন মিলিয়ে গেল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে। তার পরে আমার এল তেতালার বসতি; আগেকার সঙ্গে এর ঠিক জোড়-লাগানো চলে না।

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি যৌবনের সদর দরজায়। আবার ফিরতে হল সেই ছেলেবেলার সীমানার দিকে।

এবার ষোলো বছর বয়সের হিসাব দিতে হচ্ছে। তার আরঙ্গের মুখেই দেখা দিয়েছে ‘ভারতী’। আজকাল দেশে চার দিকেই ফুটে ফুটে উঠছে কাগজ বের করবার টগ্বগানি। বুঝতে পারি সে নেশার জোর, যখন ফিরে তাকাই সেদিনকার খ্যাপামির দিকে। আমার মতো ছেলে যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধ্য, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল, অথচ সেটা কারো নজরে পড়ল না— এর

থেকে জানা যায় চার দিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল। দেশে একমাত্র পাকা হাতের কাগজ তখন দেখা দিয়েছিল 'বঙ্গ-দর্শন'। আমাদের এ ছিল কাঁচাপাকা; বড়দাদা যা লিখছেন তা লেখাও যেমন শক্ত বোঝাও তেমনি, আর তারই মধ্যে আমি লিখে বসলুম এক গল্প— সেটা যে কী বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন করে খোলে নি।

এইখানে বড়দাদার কথাটা বলৈ নেবার সময় এল। জ্যোতিদাদার আসর ছিল তেতালার ঘরে, আর বড়দাদার ছিল আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়। এক সময়ে তিনি ডুবেছিলেন আপন-মনে ভারী ভারী তত্ত্বকথা নিয়ে, সে ছিল আমাদের নাগালের বাইরে। যা লিখতেন, যা ভাবতেন, তা শোনাবার লোক ছিল কম; যদি কেউ রাজি হয়ে ধরা দিত তাকে উনি ছাড়তে চাইতেন না, কিংবা সে ওঁকে ছাড়ত না— ওঁর উপর যা দাবি করত সে কেবল তত্ত্বকথা শোনা নিয়ে নয়। একটি সঙ্গী বড়দাদার জুটেছিলেন, তাঁর নাম জানি নে, তাঁকে সবাই ডাকত ফিলজফার বলৈ। অন্য দাদারা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন, কেবল তাঁর মটন-চপের 'পরে লোভ নিয়ে নয়, দিনের পর দিন তাঁর নানা রকমের জরুরি দরকার নিয়ে। দর্শনশাস্ত্র ছাড়া বড়দাদার শখ ছিল গণিতের সমস্যা বানানো। অক্ষিচিহ্নওয়ালা পাতাগুলো দক্ষিণে হাওয়ায় উড়ে বেড়াত বারান্দাময়। বড়দাদা গান গাইতে পারতেন না, বিলিতি বাঁশি বাজাতেন— কিন্তু সে গানের জন্য নয়, অক্ষ দিয়ে এক-এক রাগিণীতে গানের সুর মেপে নেবার জন্যে। তার পরে এক সময়ে ধরলেন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে। তার গোড়ায় শুরু হল ছন্দ-

বানানো, সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিকে বাংলা ভাষার ধ্বনির বাটখারায় ওজন করে করে সাজিয়ে তুলতেন; তার অনেকগুলো রেখেছেন, অনেকগুলি রাখেন নি— ছেঁড়া পাতায় ছড়াছড়ি গেছে। তার পরে কাব্য লিখতে লাগলেন; যত লিখে রাখতেন তার চেয়ে ফেলে দিতেন অনেক বেশি। যা লিখতেন তা সহজে পছন্দ হ'ত না। তাঁর সেই-সব ফেলা-ছড়া লাইনগুলো কুড়িয়ে রাখবার মতো বুদ্ধি আমাদের ছিল না। যেমন যেমন লিখতেন, শুনিয়ে যেতেন; শোনবার লোক জমত তাঁর চার দিকে। আমরা বাড়িসুন্দ সবাই মেতে গিয়েছিলুম এই কাব্যের রসে। পড়ার মাঝে মাঝে উচ্ছবসি উঠত উঠলিয়ে। তাঁর হাসি ছিল আকাশ-ভরা, সেই হাসির ঝোঁকের মাথায় কেউ যদি হাতের কাছে থাকত তাকে চাপড়িয়ে অস্থির করে তুলতেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাণের একটি ঘরনাতলা ছিল এই দক্ষিণের বারান্দা; শুকিয়ে গেল এর শ্রোত; বড়দাদা চলে গেলেন শান্তিনিকেতন-আশ্রমে। আমার কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়ে— ঐ বারান্দার সামনেকার বাগানে মন-কেমন- করা শরতের রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে, আমি নতুন গান তৈরি করে গাচ্ছি—

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে

কী জানি পরান কী যে চায়।

আর মনে আসে একটি তপ্তদিনের ঝাঁ ঝাঁ দুই প্রহরের গান—

হেলাফেলা সারাবেলা,

এ কী খেলা আপন-সনে।

বড়দাদার আর-একটি অভ্যাস ছিল চোখে পড়বার মতো, সে তাঁর সাঁতার কাটা। পুকুরে নেমে কিছু না হবে তো পঞ্চাশ বার এ

পার-ও পার করতেন। পেনেটির বাগানে যখন ছিলেন তখন গঙ্গা
পেরিয়ে চলে যেতেন অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁর দেখাদেখি সাঁতার
আমরাও শিখেছি ছেলেবেলা থেকে। শেখা শুরু করেছিলুম নিজে
নিজেই। পায়জামা ভিজিয়ে নিয়ে টেনে টেনে ভরে তুলতুম বাতাসে।
জলে নামলেই সেটা কোমরের চার দিকে হাওয়ার কোমরবন্দর
মতো ফুলে উঠত। তার পরে আর ডোববার জো থাকত না। বড়ো
বয়সে যখন শিলাইদহের চরে থাকতুম তখন একবার সাঁতার দিয়ে
পদ্মা পেরিয়েছিলুম। কথটা শুনতে যতটা তাক-লাগানো আসলে
ততটা নয়। মাঝে মাঝে চৰা-পড়া সেই পদ্মার টান ছিল না তাকে
সমীহ করবার মতো; তবু ডাঙ্গার লোকের কাছে ভয়-লাগানো গল্পটা
শোনবার মতো বটে, শুনিয়েওছি অনেকবার। ছেলেবেলায় যখন
গিয়েছি ড্যালহৌসি পাহাড়ে, পিতৃদেব আমাকে একা একা ঘুরে
বেড়াতে কখনো মানা করেন নি। পায়ে-চলা রাস্তায় আমি ফলাওয়ালা
লাঠি হাতে এক পাহাড় থেকে আর-এক পাহাড়ে উঠে যেতুম। তার
সকলের চেয়ে মজা ছিল, মনে মনে ভয় বানিয়ে তোলা। একদিন
ওঁরাই পথে যেতে যেতে পা পড়েছিল গাছের তলায় রাশ-করা
শুকনো পাতার উপর। পা একটু হড়কে যেতেই লাঠি দিয়ে ঠেকিয়ে
দিলুম। কিন্তু না ঠেকাতেও তো পারতুম। ঢালু পাহাড়ে গড়াতে
গড়াতে অনেক দূর নীচে ঝরনার মধ্যে পড়তে কতক্ষণ লাগত। কী
যে হতে পারত সেটা এতখানি করে মার কাছে বলেছি। তা ছাড়া
ঘন পাইনের বনে বেড়াতে বেড়াতে হঠাত ভালুকের সঙ্গে দেখা
হলেও হতে পারত, এও একটা শোনাবার মতো জিনিস ছিল বটে।
ঘটবার মতো কিছুই ঘটে নি, কাজেই অঘটন সব জমিয়েছিলুম মনে।

আমার সাঁতার দিয়ে পদ্মা পার হওয়ার গল্লও এসব গল্লের থেকে
খুব বেশি তফাত নয়।

সতেরো বছরে পড়লুম যখন, ‘ভারতী’র সম্পাদকি বৈঠক থেকে
আমাকে সরে যেতে হল।

এই সময়ে আমার বিলেত যাওয়া ঠিক হয়েছে। আর সেইসঙ্গে
পরামর্শ হল— জাহাজে চড়বার আগে মেজদাদার সঙ্গে গিয়ে
আমাকে বিলিতি চাল-চলনের গোড়াপত্তন করে নিতে হবে। তিনি
তখন জরিয়তি করছেন আমেদাবাদে; মেজবউঠাকরুন আর তাঁর
ছেলেমেয়ে আছেন ইংলণ্ডে, ফর্লো নিয়ে মেজদাদা তাঁদের সঙ্গে
যোগ দেবেন এই অপেক্ষায়।

শিকড়সুন্দ আমাকে উপড়ে নিয়ে আসা হল এক খেত থেকে
আর-এক খেতে। নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া শুরু হল।
গোড়াতে সব-তাতেই খটকা দিতে লাগল লজ্জা। নতুন লোকের
সঙ্গে আলাপে নিজের মান রক্ষা করব কী করে এই ছিল ভাবনা।
যে অচেনা সংসারের সঙ্গে মাখামাখি ও সহজ ছিল না, আর পথ ছিল
না যাকে এড়িয়ে যাওয়ার, আমার মতো ছেলের মন সেখানে
কেবলই ইচ্ট খেয়ে মরত।

আমেদাবাদে একটা পুরোনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার
মন উড়ে বেড়াতে লাগল। জজের বাসা ছিল শাহিবাগে, বাদশাহি
আমলের রাজবাড়িতে। দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন
কাজে। বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ-হাঁ করছে, সমস্তদিন ভূতে
পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সামনে প্রকাণ্ড চাতাল; সেখান

থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকে-বেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাছের পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরিআনার।

কলকাতায় আমরা মানুষ; সেখানে ইতিহাসের মাথা তোলা চেহারা কোথাও দেখি নি। আমদের চাহনি খুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা। আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো ঘরোআনা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ক্ষুধিত-পাষাণের গল্লের।—

সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবৎখানায় বাজেছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে অষ্ট প্রহরের রাগিণীতে; রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠছে; ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচ্কাওয়াজ, তাদের বর্ণার ফলায় রোদ উঠছে ঝকঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চার দিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুসফাস। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামায়ে ছুটছে গোলাব-জলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবক্ক-কাঁকনের ঝন্ঝনি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ ভুলে-যাওয়া গল্লের মতো; তার চার দিকে কোথাও নেই সেই সেই রঙ, নেই সেই-সব ধৰনি—শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি।

পুরোনো ইতিহাস ছিল তার হাড়গুলো বের ক'রে; তার মাথার খুলিটা আছে, মুকুট নেই। তার উপরে খোলস মুখোশ পরিয়ে

একটা পুরোপুরি মূর্তি মনের জাদুঘরে সাজিয়ে তুলতে পেরেছি, তা বললে বেশি বলা হবে। চালচিত্রির খাড়া করে একটা খসড়া মনের সামনে দাঁড় করিয়েছিলুম, সেটা আমার খেয়ালেরই খেলনা। কিছু মনে থাকে, অনেকখানি ভুলে যাই বলে এইরকম জোড়াতাড়া দেওয়া সহজ হয়। আশি বছর পরে এসে নিজেরই যে একখানা রূপ সামনে আজ দেখা দিয়েছে, আসলের সঙ্গে তার সবটা লাইনে লাইনে মেলে না; অনেকখানি সে মন-গড়।

এখানে কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন, বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেইরকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম। সেই বাড়ির কোনো-একটি এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে ঝক্ককে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে। আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি। পুর্থিগত বিদ্যা ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সব চেয়ে বড়ো মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান দিয়েছিলেম তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেন নি, মেনে নিয়েছিলেন। কবির কাছ থেকে একটা ডাক-নাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে— সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে, শুনলেন সেটা

ভোরবেলাকার ভৈরবীর সুরে। বললেন, ‘কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।’

এর থেকে বোধা যাবে, মেয়েরা যাকে আদর জানাতে চায় তার কথা একটু মধু মিশিয়ে বাড়িয়েই বলে, সেটা খুশি ছাড়িয়ে দেবার জন্যেই। মনে পড়ছে তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকত। যেমন একবার আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন, ‘একটা কথা আমার রাখতেই হবে, তুমি কোনো দিন দাঢ়ি রেখো না; তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে।’

তাঁর এই কথা আজ পর্যন্ত রাখা হয় নি, সে কথা সকলেরই জানা আছে। আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দৃতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষ কালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।

যে মৃত্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন, তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরি। একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল। সেটাকেই বলি ছেলেবেলা, সেটাতে মিশোল বেশি নেই। তার মাল-মসলা নিজের মধ্যেই জমা ছিল, আর কিছু-কিছু ছিল ঘরের হাওয়া আর ঘরের লোকের হাতে। অনেক সময়ে এইখানেই গড়নের কাজ থেমে যায়। এর উপরে লেখাপড়া-শিক্ষার কারখানাঘরে যাদের বিশেষরকম গড়ন-পিটন ঘটে, তারা বাজারে বিশেষ মার্কার দাম পায়।

আমি দৈবক্রমে ঐ কারখানাঘরের প্রায় সমস্তাই এড়িয়ে গিয়েছিলুম। মাস্টার পশ্চিত যাঁদের বিশেষ করে রাখা হয়েছিল, তাঁরা আমাকে তরিয়ে দেবার কাজে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায় ছিলেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মশায়ের পুত্র, বি. এ. -পাস-করা। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন লেখাপড়া শেখার বাঁধা রাস্তায় এ ছেলেকে চালানো যাবে না। মুশকিল এই যে, পাস-করা ভদ্রলোকের ছাঁচে ছেলেদের ঢালাই করতেই হবে এ কথাটা তখনকার দিনের মুরুবিরা তেমন জোরের সঙ্গে ভাবেন নি। সেকালে কলেজি বিদ্যার একই বেড়াজালে ধনী অধনী সকলকেই টেনে আনবার তাগিদ ছিল না। আমাদের বৎশে তখন ধন ছিল না, কিন্তু নাম ছিল, তাই রীতিটা ঠিঁকে গিয়েছিল। লেখাপড়ার গরজটা ছিল টিলে। ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাস থেকে এক সময়ে আমাদের চালান করা হয়েছিল ডিক্রুজ-সাহেবের বেঙ্গল একাডেমিতে। আর কিছু না হোক, ভদ্রতারক্ষার মতো ইংরেজি বচন সড়গড় হবে, অভিভাবকদের এই ছিল আশা।

ল্যাটিন শেখার ক্লাসে আমি ছিলুম বোবা আর কালা, সকল রকম একসেসাইজের খাতাই থাকত বিধবার থান কাপড়ের মতো আগাগোড়াই সাদা। আমার পড়া না করবার অস্তুত জেদ দেখে ক্লাসের মাস্টার ডিক্রুজ-সাহেবের কাছে নালিশ করেছিলেন। ডিক্রুজ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন— পড়াশোনা করবার জন্যে আমরা জন্মাই নি। মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে দেবার জন্যেই পৃথিবীতে আমাদের আসা। জ্ঞানবাবু কতকটা সেই রকমই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি একটা পথ কেটেছিলেন। আমাকে আগাগোড়া মুখস্থ করিয়ে দিলেন ‘কুমারসন্তু’। ঘরে বক্ষ রেখে আমাকে দিয়ে ‘ম্যাকবেথ’ তর্জমা করিয়ে নিলেন। এ দিকে রামসর্বস্ব পশ্চিতমশায় পড়িয়ে দিলেন ‘শকুন্তলা’। ক্লাসের পড়ার বাইরে আমাকে দিয়েছিলেন ছেড়ে, কিছু ফল পেয়েছিলেন। আমার ছেলেবয়সের মন গড়বার এই ছিল মাল-মসলা; আর ছিল বাংলা বই যা-তা, তার বাছ-বিচার ছিল না।

উঠলুম বিলেতে গিয়ে, জীবনগঠনে আরও হ'ল বিদিশি কারিগরি— কেমিস্ট্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি। এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা এই দেখতে পাই যে, গেলুম রীতিমতো নিয়মে কিছু বিদ্যা শিখে নিতে— কিছু-কিছু চেষ্টা হ'তে লাগল, কিন্তু হয়ে উঠল না। মেজবোঠান ছিলেন, ছিল তাঁর ছেলেমেয়ে; জড়িয়ে রইলুম আপন ঘরের জালে। ইস্কুল-মহলের আশেপাশে ঘুরেছি; বাড়িতে মাস্টার পড়িয়েছেন, দিয়েছি ফাঁকি। যেটুকু আদায় করেছি সেটা মানুষের কাছাকাছি থাকার পাওনা। নানা দিক থেকে বিলেতের আবহাওয়ার কাজ চলতে লাগল মনের উপর।

পালিত-সাহেব আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন ঘরের বাঁধন থেকে। একটি ডাঙ্গারের বাড়িতে বাসা নিলুম। তাঁরা আমাকে ভুলিয়ে দিলেন যে বিদেশে এসেছি। মিসেস স্কট আমাকে যে স্নেহ করতেন সে একেবারে খাঁটি। আমার জন্যে সকল সময়েই মায়ের মতো ভাবনা ছিল তাঁর মনে। আমি তখন লড়ন যুনিভিসিটিতে ভর্তি হয়েছি; ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেনরি মর্লি। সে তো পড়ার বই থেকে চালান-দেওয়া শুকনো মাল নয়। সাহিত্য তাঁর মনে, তাঁর গলার সুরে, প্রাণ পেয়ে উঠত— আমাদের সেই মরমে পৌঁছত যেখানে প্রাণ চায় আপন খোরাক— মাঝখানে রসের কিছুই লোকসান হ'ত না। বাড়িতে এসে ক্ল্যারেন্ডন প্রেসের বইগুলি থেকে পড়বার বিষয় উল্টেপাল্টে বুঝে নিলুম। অর্থাৎ, নিজের মাস্টারি করার কাজটা নিজেই নিয়েছিলুম।

নাহক থেকে থেকে মিসেস স্কট মনে করতেন আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তিনি জানতেন না— ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে ব্যামো হবার গেট বন্ধ। প্রতিদিন ভোরবেলায় বরফ-গলা জলে স্নান করেছি। তখনকার ডাঙ্গারি মতে, এরকম অনিয়মে বেঁচে থাকাটা যেন শাস্ত্র ডিঙিয়ে চলা।

আমি যুনিভিসিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র। কিন্তু, আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছাঁওয়া লেগে। আমাদের কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নৃতন নৃতন মাল-মসলা। তিন মাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশোলটি ঘটেছিল। আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সঙ্কেবেলায়, রাত এগারোটা পর্যন্ত, পালা করৈ কাব্য নাটক ইতিহাস

পড়ে শোনানো। এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে।
সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের
মনের মিলন।

বিলেতে গেলেম, বারিস্টর হই নি। জীবনের গোড়াকার
কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাই নি। নিজের মধ্যে
নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত-মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি
প্রাণের মধ্যে।



₹ 70

ISBN 978-81-7522-403-2

9 788175 224032